

কিশোর ম্যাগাজিন

ভাল

৪ৰ্থ সংখ্যা

জুন-আগস্ট ২০২৩

- মুখোশ
- আখ চূরি

- রহস্যাজ্ঞা
- আদবকেতা সিরিজ

- একটি ভয়ংকর রাত্রি
- হোস্টেলের এলোমেলো দিনে
- অংগীর্ণিক মুক্তি অর্জনের উপায়

জন্মীপন

ঘরে বসে আপনার
পছন্দের পণ্যটি অর্ডার করুন
ওয়াফিলাইফে!

ওয়াফিলাইফ

www.wafilife.com



দেশের যেকোনো প্রান্তে
ডেলিভারি



মগ্না হাতে পেয়ে
মূল্য পরিমোৰ্শ



নানান অফার
ও শিফট



ইজি রিটার্ন
পলিসি



ওয়াফিলাইফের
মোবাইল অ্যাপ
ভাট্টনালাভ ক্ষেত্র
QR কোডটি আপন করুন



হাসা ৩১০, রোড ২৯,
মজুমাদপুর টি.ও.এচ.এস, ঢাকা।
www.wafilife.com
01799925050

ওয়াফিলাইফের
ফেসবুক পেজে
মুক্ত হতে
ক্লিক করুন



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



চতুর্থ সংখ্যা
জুন-আগস্ট, ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ত্ব কেন্দ্র মোলো

সম্পাদনা : লস্ট মডেস্টি
প্রচ্ছদ : ওমর ইবনে সাদিক
গ্রাফিক্স : শাহরিয়ার হোসাইন
পৃষ্ঠাসংজ্ঞা : আসাদুল্লাহ আল গালিব

মোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial



মোলো ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/sholo

লস্ট মডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

প্রকাশনা ও প্রাপ্তিষ্ঠান:

মন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
www.wafilife.com

মূল্য : ৭০ টাকা

অন্দরমহল

৪	আখ চুরি	৪৬	বড়শি
১১	এক ভয়ংকর রাত	৪৯	গ্রাফিক ডিজাইনের আদ্যোপান্ত
১৮	মেলায় হারিয়ে ঘাওয়া ছেট ভাই ও পড়া মুখস্থের সমস্যা	৫১	লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি (২য় পর্ব)
১৭	বালিতে লেখা চড়	৫৩	রহস্যজট
১৯	মৌমাছির জীবনচক্র	৫৪	আদবকেতা সিরিজ : আগে যদি জানতাম রে!
২২	হোস্টেলের এলোমেলো দিনগুলো সাজিয়ে নাও	৫৭	ভুল হলে ফুল হয়ো
২৭	স্মৃতিচারণ	৬০	দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?
২৮	মুখচোরা	৬৪	কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব? (২য় পর্ব)
৩০	মুখোশ	৬৯	অরিগামি
৩২	পরিণাম	৭০	ব্যবসায় নামার আগে..
৩৪	বাংলার সিংহপুরুষ : হাজী শরীয়তউল্লাহ	৭১	সমাপ্ত জীবনের গল্প
৩৭	ফলোয়ার	৭৩	কমিকস
৩৯	দুআ সিরিজ : বিষধর প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ	৭৪	ভালোবাসা বনাম ভালোবাসা
৪০	ট্যালেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু তোমার পকেটে!	৭৭	চোখের সামনে জান্মাত ক্রয়
৪৩	মাটির মাসজিদ	৭৯	গণিত ধাঁধাঁ

ମୁଖସଙ୍କ

ସବ କହେର କ୍ରେଶ ଦୟାନ ଥାକେ ନା । କିନ୍ତୁ ସବ ଭୁଗତେ ପରା ଅସଭବ । ଏହା ଶରୀର-ମାଧ୍ୟ-ମନ ସବ କାହାରେ ଥାକେ । ଯେତେ ଚାହୁଁ ନୀ ଡାକ୍ତିଯେ ଦିଲେଓ ଫିଲେ ଆପେ ଆପାର ଶକ୍ତିପୋଡ଼ ହେବ ।

ଠିକ୍ ସେବକମ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତ ତାଙ୍କ କହେ ବେଳୋଯ ଆମଦେର କବ ସମୟ । ତାଙ୍କ ଦୂର କରିବେ ଯଥିଲ ପାଢ଼ାର ଜାଗେ ଦେବାନେ ବାଲି, ଠିକ୍ ସେବାନେଇ କାହାର ହୋଟ ଆଇଯେର ବୟାସୀ ହୃଦୟେଟାକେ ଦେବି ବିଭିନ୍ନ ଆଖନ ଧରାଇଁ । ମନେ ହୁଏ, କେତେ ଏକଜଣ ବୁଦେର ହେତୁରେ ଧାରାଲେ କୁରି ନିଯେ କୁଟୋ କରେ ଦିଲେଇଁ ।

ଆପେର ପେହଳେର କିନ୍ତୁ ପିଠି ଏକଟା ହେଲେକେ ସଥିଲ ଦେବି ପାର୍ଶ୍ଵରେର ହାତ ଧରେ ଥିଲେ ଏହି, ନିଯେକେ ଧିକ୍କାର ନିତେ ଥାକି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲାକ୍ଷେତ୍ର ପାଢ଼ା ରାଜମହାରେ ସଥିନ ଦେଖି, ରାତର ପର ରାତ ଜେଣେ ହେତୁ ବାବାର ପଞ୍ଚଶିରା ଟାକା ଡାକ୍ତିଯେ ନିଷେଷ ନିଧିକାର୍ତ୍ତରେ ପେହଳେ, ମାଧ୍ୟାଟା ହେବ ଥାବେ ।

ଆହା ! କବ ସହ ଲେଖି ଉଦେର ନିଯେ, ଓର ବିଲି ବୁଝିବ । ସବ ବଧା ବିପକ୍ଷିତ ମୁହଁର ଉଦେର କହିଯେ ଏକେ ଏକେ ତାନା ମେଲରେ ଆବର ସ୍କୁଲର ବୃକ୍ଷି ସତୀବତର ଉତ୍ତରାଳେ ପୃଥିବୀର ପଥେ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଟୋରେ ଯୁଦ୍ଧ । କବ ଦେଖି, କବା କେବେ ଆପେର ସବ ଶୋଭା ଅଣ୍ଟିତ, କବ ମୋହ । ଏକେବାରେ ହିରୋଗ ମତୋ... ସହ... କବ... କବ ।

ମାଧ୍ୟାଟା ନିଯେ ଡାକ୍ତା ମେହ ଦୁଃଖଗୋ ନିଯେଇ ଆମର କବ କରେଇଲାମ 'ହୋଲୋ'ର ଶାଶ୍ଵତ । ଆଜ ଏକବୁକ ଆଶ ନିଯେ କହେ କହେ ପିଲି ଆକିଯା ଥାକେ ଆମଦେର ଲିକେ । ଇମବ୍ରତ କହେ, 'ଭାଇୟା, ପରେର ସବ୍ୟ କବେ ଆମବେ ? ଏକବୁକ ତାଙ୍କାତି ବେର କରିବେଳ ହିତ ' ବଢ଼ ଆଲୋ ପାଶେ । ଆବତ ବଢ଼ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ ହେତେ କହେ । 'ହୋଲୋ'ର ନରଶୈଖ ଶଂଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ହେଯିଲ ଶବ ବହର । ଏରପର ଆହା ଏକଟି ବହର କେଟେ ହେତେ । ଏହି ସମୟର ଆମରା ବିଭିନ୍ନ କାରଣେ ଖାରାହିକ ଥାକିବେ ପାରିବି । ଏ ଜଳା ଆମଦେର ଶୋଭାଦେର କାହେ ଆମରା ଘରାହାଇଁ । ଆମଦେର ଦୀର୍ଘବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟ କହେ ନିଯେ, ଭାଇଯାପୁରୀ ।

ଏବାରେ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ମିତ ବିଭାଗେର ସାଥେ ଆଦବକେତା ସିରିଜ, କାର୍ଯ୍ୟାବାର ପାଇତମାଇନ, କରିବିସ ଇତାନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶୁଭ ହେଯାଇଁ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ହେତୁରେ ଆମଦେର ପାଇକିନ୍ତିମିନିମି ମାଗାଜିନ୍ରେ ପାରିବାରିରେ ମାର୍କିଟରେ ମର୍ମରିଚ କେବେହି ଆମରା

ତାରପରି ଭୁଗତେଟି ଧରା ବାତାବିକ । ମାଗାଜିନ୍ରେ ମାନୋମହିମ ହେବୋମେ ଉତ୍ସମ ପରାମର୍ଶ ଦିଲେ ଆମଦେର ମହିମାଗତା କରିବେ ପାରୋ । ପାଇବି ପାଇବେ ପାରୋ ଆମଦେର ଇ କେଇଲେ ବିହିବି କେବୁକ ପେଇବେ । ମେହ ସାଥେ ପରେର ସଂଖ୍ୟାର ଭଳ ପାଇବେ ପାରୋ ତୋମାର ଲେଖ୍ୟ ଯେକେଦୋ ବିଷଯରେ ।

'ହୋଲୋ' ନିଜେ ପାଢ଼େ । ବନ୍ଦୁଦେର ହେତୁ ଦାଖି । 'ହୋଲୋ'-କେ ଡାକ୍ତିଯେ ନାହିଁ ହୃଦୟର ହାତର ବର୍ଗମାଇନ୍ରେ ପ୍ରତିଟି କୋପାଥ ଦୋଷାଥ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିନେଟ

ସମ୍ପଦକ, 'ହୋଲୋ' ମାଗାଜିନ

editor.sholot@gmail.com

আঁধ চুরি

আশুলাহ আশুর রহমান



দৌড়াচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে...

আকাশে কার্তিকের চাঁদ। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় শূন্য মাঠের শূন্যতা আরও বেড়েছে। গত পাঁচ মিনিট ধরে দৌড়াচ্ছি। আমি একা না। আমার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও ৪/৫ জন। সবুজ, সজীব, আপন, শামীম, মানিক। একই স্কুলের একই ফ্লাসে পড়ি আমরা। এলাকার সবাই একবাবে আমাদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয়—ওরা খুব ভদ্র ছেলে!

তবে আর বোধহয় এমন সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। গত পাঁচ মিনিট ধরে আখ খেতের মালিকের তাড়া খেয়ে ছুটছি আমরা। স্কুলের মাঠ, রাস্তা পাড়ি দিয়ে এখন শূন্য খেতের মধ্যে নেমেছি। মালিক টর্চ জ্বালিয়ে পিছু নিয়েছে আমাদের। ধরাই পড়ে যাব মনে হচ্ছে। মাঠের শেষে চলে এসেছি আমরা প্রায়। আর কিছুদূর গেলেই নদী শুরু। গরমের রাত হলে কথা ছিল না। তবে এই শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা পানিতে নামার কোনো উপায় নেই। কাল সকালে এলাকায় যে কী করে মুখ দেখাব! সব দোষ ওই ব্যটা আপনের। সে-ই আমাদের বুদ্ধি দিয়েছিল! এখন কী এক মুসিবতে পড়লাম!

**দুই মিনিটের মাথায় নদীর তীরে
পৌঁছে গেলাম আমরা।** পালাবার
আর উপায় নেই। নিয়তির হাতে
সব ছেড়ে দিয়ে আমরা লাইন ধরে
দাঢ়ালাম। ধাওয়াকারী টর্চটাও
একেবারে কাছে চলে আসলো।
টর্চ-মালিক আমাদের মুখে টর্চ
মারল। ২০ সেকেন্ড কোনো কথা
বের হলো না তার মুখ দিয়েও।

কথা বের হলো না আমাদের মুখ দিয়েও।
এরপর সবার মুখ খেকেই একযোগে বেরিয়ে
আসলো—অ্যাএএ!

দুই.

বছর শেষের পরীক্ষা হয়ে গেছে। কোনো কাজ কাম নেই। আমরা সকালে বের হই সাইকেল নিয়ে। দুপুরে একবার বাসায় গিয়ে নাকেয়ুখে কিছু গুঁজে দিয়ে আবার সাইকেল নিয়ে বের হই। কোনো কোনো দিন মাঠে ক্রিকেট খেলি। তবে বেশিরভাগ পোলাপানই গেইম আর টিকটক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ক্রিকেট তেমন একটা খেলা হয় না। মাঝে দুদিন মানিকের কোনো খবর নেই। আজ সাইকেল নিয়ে বাড়ের বেগে উড়ে আসলো। আমরা তখন বসে ছিলাম মাঠের পাশের বাগানে। সাইকেলটা কোনোমতে স্ট্যান্ড করেই আমাদের পাশে এসে বসে কথা বলতে শুরু করল। তবে এত দ্রুত সাইকেল চালিয়ে এসেছে যে, খুব জোরে জোরে শাস-প্রশাস পড়ছিল। উত্তেজনায় কোনো কথাই বের হচ্ছিল না তার মুখ দিয়ো। একটু স্বাভাবিক হবার পর সে শোনাল এই দুই দিনের তার এডভেঞ্চারের কথা...

মানিক গিয়েছিল তার ফুপির বাসায়। ফুপাতো ভাই আছে কয়েকটা। কয়দিন খুব মজা করেছে ও। ফুপিদের বাড়ির পাশেই ছিল এক মস্ত বিল। সেই বিলই ছিল তাদের এডভেঞ্চারের কেন্দ্রবিন্দু। শীতকাল। বিলে পানি খুব বেশি নেই। যা আছে তাও শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দুপুর পর্যন্ত ওরা মাছ মেরেছে কাদার ভেতর। দেশি মাগুর, শিং, কই মাছের বোল দিয়ে জম্পেশ একটা খাওয়া দিয়েছে দুপুরে। এরপর পড়ে পড়ে ঘুমাইছে অনেকক্ষণ। উঠেছে একবারে সূর্য ডুবতে বসা সম্ম্যায়। এরপর আবার চলে গিয়েছে বিলে। ধান কাটা হয়ে ধাওয়া শূন্যক্ষেত্রে হাঁস দিয়ে পিকনিক করার জন্য। বেশ রাত পর্যন্ত খাওয়াওয়া, আনন্দ-ফুর্তি করার পর বাড়ির পথ ধরেছে ওরা। লাইন দিয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা আখ ক্ষেত্রের পাশে চলে আসে ওরা। মানিকের ছোট ফুপাতো ভাই সাদের মাথায় চেপে বসে। সবার পেছনে ছিল সে। চুরি করা ফল না কি খুব সুস্বাদু

হয়। কয়েকটা আখ সাবাড় করে দিলে কেমন হয়? হাতের কাছেই তো আছে। হাঁস জবাই করার বটিটা দিয়ে কয়েকটা কোশ দিতে হবে কেবল। তাহলেই হলো!

বেশিক্ষণ ভাবাভাবিতে সময় নষ্ট করল না সে। বটি দিয়ে কয়েকটা পোচ দিল আখের গাছে। নিপুণ দক্ষতায় আখগুলো হাতে তুলে নিল।

- দৌড় দে, মানিক। ভাইয়া, দৌড় লাগান।

বাকিরা কিছু বুবো উঠার আগেই দৌড়ে অনেকদূর চলে গেল সাদ। আখ থেতের অপর পাশ থেকে শক্তিশালী একটা টর্চ জলে উঠল। পুরুষালী একটা কঠে হাঁক আসলো—কে রে, আখ চুরি করে কে?

এবার মানিক আর অন্যরাও বুবাল সাদ কী করেছে। ভৌ দৌড় দিল তারাও। পুরুষালী কঠও বুৰাতে পেরেছে ঘটনা সত্য। শেয়াল টেয়াল নয়, আসলেই আখ চুরি হচ্ছে তার ক্ষেতে। ‘ধৰ, ধৰ’ চিৎকার করে দৌড় দিল সেও। কিন্তু ততক্ষণে মানিকরা পগার পাড়।

‘বুবালি, আমার খুব ভয় লাগছিল। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা লাফাছিল। কিন্তু যখন একেবারে নিরাপদ জায়গায় চলে আসলাম আর আখে প্রথম কামড়টা দিলাম, তখন মনে হচ্ছিল এত সুস্বাদু আখ আমি আমার জীবনে আর খাইনি। চুরির ফলের আসলেই খুব স্বাদ হয়।’ হাসি হাসি মুখে বলছিল মানিক।

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।’ সহমত জানাল শামীম। ‘মামার বাসায় গিয়ে আমিও একবার এরকম ফল চুরি অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। চুরির ফল আসলেই খুব সুস্বাদু হয়।’

‘তুই কী চুরি করেছিলি?’ প্রশ্ন করল মানিক।

আমি চুরি করেছিলাম ডাব। আমি আর আমার দুই মামাতো ভাই মিলে মামার গাছেই।

সে কী! নিজের মামার গাছেই! কেন? প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা সবাই।

আর বলিস না। মামা ছিল ভীষণ কৃপণ। কী কঢ়ি কঢ়ি ডাব ধরে আছে গাছে। কিন্তু আমাদের থেতে দেবে না। বিক্রি করবে। আর টাকা জমাবে। তাই এই ব্যবস্থা আরকি।

তা কীভাবে চুরি করলি? বল দেখি পুরো ঘটনা।

সেদিন বিকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। সন্ধ্যা না যেন ঘুটঘুটে রাত। কারেন্ট নেই। মামা গিয়েছে হাটে। বাসায় আমরা ছাড়া পুরুষ মানুষ বলতে কেউ নেই। নানীকে বললাম—নানী, আমরা মাগরিবের নামাজ পড়তে যাচ্ছি। আগে থেকেই বাহিরে একটা ধারালো বটি লুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা খড়ের গাদায়।

বড় মামাতো ভাই বাদুড়ের মতো তরতর করে উঠে গেল গাছে। ছোট মামাতো ভাইরে থেকে মেইন গেটের শেকল আটকে দিল। আমি রইলাম গলির মুখে পাহারায়। ডাব গাছটা ছিল একেবারে বাড়ির বাউন্ডারি ঘেঁঁ। কারেন্ট ছিল না, আগেই বলেছি। তারপরেও গাছের ওপরের শব্দে নানী ঠিকই টের পেল গাছে কেউ উঠেছে। নানী চিৎকার দিয়ে উঠল, গাছে কে উঠেছে রে?

ছোট মামাতো ভাই ছিল ভীষণ চালাক। গলা মোটা করে সে বলল, আমরা ডাকাত। চুপ করে থাকো। চিৎকার-চেচামেচি করলে ফল ভালো হবে না। বাহিরে থেকে দরজা লাগানো। তোমরা কেউ বের হতেও পারবে না।

বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল।^[১] বড় ভাই আর বেশি সময় নিল না। ঘটপট নেমে আসলো অনেকগুলো ডাব নিয়ে। সুন্দরমতো খড়ের গাদার পেছনে আমাদের গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ বাহিরে ঘোরাঘুরি করে মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরলাম এমন

[১] নানী আসলে বুবাতে পেরেছিল, এমন কাজ আমরা ছাড়া আর কেউ করার সাহস পাবে না।

ভাব নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। বাড়ি ফিরতেই শামীম খুব উন্নেজিত হয়ে বলতে লাগল, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তাব কেটে নিয়ে গেছে। আমরা লুকিরে মুচকি মুচকি হাসছিলাম। মাঝা বাসায় ফিরলে মাঝাকেও জানালেন তিনি। মাঝা কিছুক্ষণ বকাবকি করলেন ডাকাতদের। আফসোস করলেন কত ক্ষতি হয়ে গেল তার এই ভেবে।

সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমরা বের হয়ে আসলাম। গোপন জায়গা থেকে ডাব বের করে প্রাণভরে খেলাম।

- বাহ! তোরও তো দেখি চুরির অভিজ্ঞতা আছে।
বেশ মুঞ্চতা নিয়েই বলল সজীব।

তন্ময় হয়ে আমরা এতক্ষণ গল্ল শুনছিলাম।

আমাদের পাশে বসে শয়তানও
বোধহয় খুব মনোযোগ দিয়ে গল্ল
শুনছিল। চুরির গল্ল শেষ হতেই
হৃশি ফিরল তার। লাড়াচাড়া দেওয়া
শুরু করল আমাদের। আপন বলে
উঠল, ‘চল, আমরাও আজকে কিছু
একটা চুরি করি।’

সবাই একবাক্যে সাড়া দিলাম। সত্যি কথা বলতে মানিক আর শামীম যখন চুরির গল্ল বলছিল, তখন আমাদের একটু হিংসা হিংসা লাগছিল। ওরাও এমন ভাব নিয়ে গল্পগুলো বলল, যেন তারা একেকজন হিরো। তাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম আমরা।

সবই তো বুবলাম। কিন্তু চুরি করব কী?

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম আমরা।

ইউরেকা! চিংকার দিয়ে উঠল আপন।

সবাই ওর দিকে তাকালাম জিঙ্গাসু দৃষ্টিতে। সজীব অস্ত্রিতার রোগে ভোগে। সে আপনের প্রায় কোলে উঠে তার কাঁধের দুইপাশে ধরে ঝাকাতে লাগল।

- কী পেয়েছিস তাড়াতাড়ি বল।

সবজান্তার হাসি হেসে আপন বলল, সবাই আমার কাছে আয়। আস্তে আস্তে বলি। আশেপাশের কেউ শুনে ফেললে আমাদের খবর হয়ে যাবে।

আপনকে একটু ক্যাবলাকান্ত টাইপের মনে হয় আমার কাছে। ও যে কী পেয়েছে তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সবাই যেহেতু যাচ্ছে, আমিও গেলাম। ফিসফিস করে ও পরিকল্পনা বলে গেল। সব শুনে হাসি ফুটল আমাদের সবার মুখেই।

তিন.

রাত আটটা ঠিক করা ছিল আমাদের একশান টাইম। সাক্ষাতের জায়গা সেই মাঠের পাশের আম বাগানই। সাক্ষাতের সময় ৭ টা ৪৫ মিনিট। ৭ টা ৩০ এর দিকে চুপি চুপি বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। আমবাগানে পৌঁছে দেখি এরইমধ্যে বাকিরা সবাই চলে এসেছে। চকচকে একটা বটি নিয়ে এসেছে সজীব। আপন এনেছে ছেট একটা টার্চ লাইট।

আমাদের টার্চেটি হলো মাঠের ওইপাশের বারোমাসি আখক্ষেত। বিকেলেই আপন আর মানিক আশপাশ রেকি করে এসেছে। পাহারা থাকে না কোনো। তাই তেমন কোনো বিপদ নেই। তবুও সাবধানের মার নেই। প্রায় নিখুঁত একটা প্ল্যান সাজিয়েছে আপন, মানিক আর শামীম মিলে।

মূল একশান অর্থাৎ আখ কাটতে যাবে আপন আর শামীম। প্রথমে মানিক আর শামীম যেতে চেয়েছিল, যেহেতু ওরা অভিজ্ঞ। কিন্তু প্ল্যান যেহেতু আপনের মাথা থেকে বের হয়েছে, তাই আপন নিজেই যাবে বলে গো ধরল। আসলে আখ চুরির এই বিরল সম্মান অর্জনের সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে আমরা মানিককে রাজি করালাম।

মাঠের এই পাশের অর্থাৎ আমবাগানে পাহাড়া
দেৱার দায়িত্বে থাকলাম আমি আৱ সজীব।
সজীবকে আমি সাথে নিতে চাচ্ছিলাম না।
অস্থিরতা আৱ তাড়াছড়াৰ জন্য না জানি আমাকে
কী বিপদে ফেলে। কিন্তু সবাই মিলে আমাকে
গচ্ছিয়ে দিল। সিগন্যাল ঠিক হলো কোকিলেৰ
ডাক। কেউ আসলে মূল দলকে সতৰ্ক কৱে
দেৱার জন্য দুইবাৰ কোকিলেৰ ডাক ডাকব
আমৰা।

- এই শীতকালে কোকিল ডাকে না কি? আপনি
জানলাম আমি।

- ‘আৱে ব্যাটা, মাথা খারাপ! কিছু কোকিল
থাকে না, হটহট কৱে ডাকে? মনে কৱে
ওইৱেকম কোকিল।’ ভূগোল বোানোৰ চেষ্টা
কৱল আমাকে আপনা। আগেই বলেছি ও একটা
ক্যাবলাকাস্ত। কিন্তু ওই যেহেতু মূল পৱিকল্পনা
কৱেছে আৱ বাকিৱা সবাই ওকে সমৰ্থন দিচ্ছে
দেখে আমি আৱ তেমন কিছু বলতে পাৱলাম না।
মাঠের ওইপাশের অর্থাৎ আখ ক্ষেত্ৰে পাশে
পাহাড়াৰ দায়িত্ব একাই নিল সবুজ। কেউ
আসলে ও ডাকতে থাকবে শেয়ালেৰ ডাক।
নিখুঁত শেয়ালেৰ ডাকতে পাৱে সে।

মানিক চালাক চতুৱ। ওৱ ডিউটি পড়ল
আমবাগান যে মেইনৰোডেৰ ধাৱে সেইখানে।
কেউ আমবাগানেৰ এদিক থেকে আখক্ষেত্ৰেৰ
এদিকে আসতে লাগলে এই কথায় সেই কথায়
তাকে ভুলিয়ে রাখবো।

আটটা বাজতেই শুৰু হয়ে গেল আমাদেৱ
অপাৱেশন।

প্ৰথমে গেল এডভাল্ড পাটি অর্থাৎ সবুজ।
আশেপাশ ভালো মতো জৱিপ কৱল সে। এৱপৱ
একবাৱ শেয়ালেৰ ডাক শুনতে পেলাম আমৰা।
বিসমিল্লাহ বলে বুকে দুআ দৱলদ পড়ে ফু দিতে
দিতে বেৰিয়ে গেল আপন আৱ শামীম।

আমৰা দুৰু দুৰু বুকে অপেক্ষা কৱাছি। সজীব
অস্থিৱ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাছে আৱ

হাতেৰ আঙুল মটকাছে। আপনৱা যাওয়াৰ ২
মিনিটও হয়নি, এমন সময় ধূপধাপ শব্দ শুনলাম
আমৰা। চাঁদেৰ আলোয় দেখলাম উৰ্দ্ধশাসে
দৌড়ে আসছে ওৱা তিনজন। পেছনে টুচ
লাইট নিয়ে আৱও একজন আসছে। নিশ্চয়ই
আখক্ষেত্ৰেৰ মালিক বা পাহাড়াৰ!

- কী হয়েছে, কী হয়েছে? কাছাকাছি আসতেই
দৌড়ে ওদেৱ দিকে গেল সজীব।

- দৌড়ে না থামিয়েই উচ্চস্বৰে ঘনঘন শ্বাস ফেলে
শামীম বলল, দৌড়ে লাগা ব্যাটা। ধৰতে পাৱলে
খবৰ আছে।

এক সেকেন্ড দেৱি না কৱে দৌড়ে দিলাম আমি।
একটু পৱ পিছু ফিৱে দেখি সজীব সেখানে ঠায়
দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঘটনাৰ আকস্মিকতায়
সে কী কৱবে বুবো উঠতে পাৱছে না।
কিংকৰ্ত্ববিমৃত্য থাকে বলে। আমি তাৱ হাত ধৰে
এক হ্যাচকা টান মাৰতেই হুশ ফিৱল তাৱ। এক
দৌড়ে সবাইকে ছাড়িয়ে সবাৱ সামনে চলে গেল
সে। সজীব আমাদেৱ স্কুলেৰ সেৱা দৌড়বিদ।
প্ৰত্যেকবাৱ বাৰ্ষিক ক্রীড়া প্ৰতিযোগিতায় দৌড়ে
ফাৰ্স্ট প্ৰাইজ পায় সে।

দৌড়াতে দৌড়াতে শামীমেৰ পাশে আসলাম।

- ঘটনা কী?

দৌড়াতে দৌড়াতে শামীম যা বলল তাৱ সাৱমৰ্ম
হলো—

সবুজ প্ৰথমে গিয়ে আশপাশ
ভালোমতো দেখে আমাদেৱ গ্ৰিন
সিগন্যাল দেয়। আমৰা সেখানে
গেলাম। দুইটা ভালো মোটা আখ
দেখে কোপ মেৰেছি। আপন হালকা
কৱে আলো জ্বালিয়েছে। আৱ সঙ্গে
সঙ্গে আখক্ষেত্ৰে ওইপাশ থেকে
কে জানি হই হই কৱে উঠল- ‘দাঁড়া,
আমি আসছি।’

সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে ফেলল আপন। এৱপৱ

আমরা দৌড় দিলাম দুইজন। একটু পর দেখি সবুজও দৌড়ে আসছে। আসলে গ্রিন সিগন্যাল দেবার পরপরই সবুজ সেই লোকটাকে দেখতে পায়। কিন্তু সে তখন ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে আমাদের সতর্ক করার জন্য শেয়ালের ডাক বের করতে পারেনি একটাও।

চার.

গল্পের প্রথম অংশে ফিরে যাই। ধাওয়া খেয়ে আমরা সবাই নদীর একেবারে কিনারো। ধাওয়াকারী টর্চ লাইটওয়ালা আমাদের মুখে আলো ফেলল। আমরা ও টর্চওয়ালা... সবাই চমকে উঠলাম। আসলে আমরা কেউই কাউকে আশা করিনি।

টর্চওয়ালা হলো আমাদের পাড়ার মাসুদ কাকু। গাঞ্জাখোর হিসেবে আশেপাশের দশগ্রামে এবং অবশ্য থানার পুলিশদের কাছে বেশ সুখ্যাতি আছে তার। আখক্ষেতের ঐপাশে সে গিয়েছিল গাজা খেতে। অপেক্ষা করে বসে ছিল সে। তার ইয়ার দোষ্টরা আনতে গিয়েছিল গাজা। দেরি হচ্ছিল বোধহয় অনেক। তাই মাসুদ কাকু অস্ত্রিল হয়ে পড়ে। শামীমদের আখ কাটার শব্দ শুনে সে ভেবেছিল, বোধহয় তার দোষ্টরা গাজা নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু এদিকে শামীমরা আবার ভেবে বসে আখক্ষেতের মালিক ক্ষেত পাহারা দিয়েছে। তাই ওরা ছুট লাগায়। গাজা খাবার নেশায় অস্ত্রিল মাসুদ কাকু ভাবল, দোষ্টরা বোধহয় তাকে গাঁজার ভাগ দেবে না। তাই সেও শামীম অর্থাৎ আমাদের সবার পিছু নেয়।

ইয়ার দোষ্টদের বদলে আমাদের দেখে মাসুদ কাকু একটু নিরাশ হয়। আমরা স্বত্ত্বির হাফ ছেড়ে বাঁচি।

‘এত রাতে তোমরা এখানে কী করছ? দৌড়াদৌড়ি করছিলা কেন?’ কিছুটা বিরক্তি নিয়ে প্রশ্ন করে মাসুদ কাকু।

‘না মানে, আমরা লুকোচুরি খেলছিলাম।

জ্যোৎস্না রাত তো... পরীক্ষা শেষা’ মানিক উন্নত দিল আমাদের সবার হয়ে।

বাহ! বাহ! বেশ ভালো। ছোট থাকতে আমরাও কত খেলেছি। কিন্তু এখন তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আর বাইরে থেকো না। যাও বাসায় যাও।

কাকুর কথা মেনে নীরবে যে যার বাসায় চলে গেলাম আমরা। একদিনের জন্য যথেষ্টেরও বেশি এডভেঞ্চার হয়ে গিয়েছে!

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা...[১]

মূল গল্প এখানেই শেষ। চৰৎকাৰ এই গল্পটাৰ পৱ কিছু জ্ঞানেৰ কথা বলে তোমাদেৱ মজাটা নষ্ট কৰে দিতে চাচ্ছ না। তবে গল্পেৰ বিষয়টি আসলে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। দু চারটা জ্ঞানেৰ কথা ৰেতেই ফেলি, কী বলো?

১। এৱকম চুৱি কৰে ফলমূল খাবাৰ অভ্যাস আমাদেৱ অনেকেৱই কৰৰেশি ছিল আৱকি ছোটবেলায়। তখন আমরা অবুৱা ছিলাম। অনেক কিছুই বুৰাতাম না। তবে এই বড়বেলায় এসে কিন্তু আৱ ফল চুৱি কৰে খাওয়া যাবে না।

২। তোমৰা যারা ছোট আছ, এখনই শপথ কৰো আৱ এভাৱে ফল চুৱি কৰে খাবে না। এভাৱে চুৱি কৰে ফল খাওয়াটা ঠিক নয়। এতে অন্য মানুষেৰ হক নষ্ট হয়। এটাতে ক্ষণিকেৰ মজা পাওয়া গেলেও পৱে অনেক আফসোস কৰতে হবো।

৩। যারা ইতোমধ্যেই ফল চুৱি কৰে খেয়েছে, তারা কী কৰবে? আলিমগণ বলেন[২]- ছোটবেলায়

[১] লস্ট মডেস্টি

[২] ছোটবেলায় কাৰণ গাজেৰ ফল চুৱি কৰে খেয়ে ফেলেছি, এখন কী কৰব? শায়খ আহমদুল্লাহ- <https://tinyurl.com/folchuri>

ছোটবেলায় অন্যেৰ গাছ থেকে চুৱি কৰে খাওয়া ফল এখন মেভাৱে মাফ পেতে পাৰেন। Mawlawi Zahirul Islam- <https://tinyurl.com/y9vbhexb>

চুরি করে ফল খাওয়ার অপরাধ মাফ পাবার জন্য
যা যা করা যেতে পারে :

- ক) ফলের মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
খ) চুরি করা ফলের মূল্য হিসেব করে
(আনুমানিক) সেই ফলের মালিককে পরিশোধ
করতে হবে। মালিক বেঁচে না থাকলে মালিকের
উত্তরাধিকারীদের কাছে দিতে হবে।

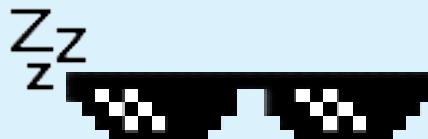
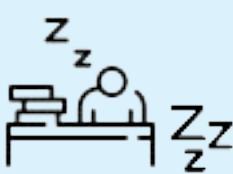
গ) যদি মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে,
মূল্য পরিশোধ করতে গেলে সম্পর্ক খারাপ হয়ে
যাবার, ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে
ফলের আনুমানিক মূল্য দান করে দিতে হবে।
আল্লাহর কাছে ফলের মালিকের জন্য দুआ
করতে হবে।



ভবিষ্য করি কাজ!

নিজেকে বেশ বিচক্ষণ মনে করি বলে যেকোনো কাজ করার আগে চিন্তা-ভাবনা
করি। ভালোমতোই ভেবে নিই। কারণ, পরে কাজের ফলাফল যেন আমার বা
অন্য কারও ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঢ়ায়। তারপর কাজে হাত দেওয়ার আগে
আরেকটু চিন্তা করি। যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করার পর কাজটা শুরু করার আগে
আরও চিন্তা করি।

ততক্ষণ চিন্তা করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনে হয় কাজটা আসলে না করলেও
চলবে। এরপর আমি অন্য কাজে মনোনিবেশ করি। একইভাবে। অহংকার করছি
না। সত্যি বলতে, আমি সারাক্ষণই কাজে ডুবে থাকি।



ମନ୍ଦ ଡେହୁଙ୍କର୍ମ ଧାତ

ମୋହାମ୍ମାଦ ଆଲ ଆମିନ

ଶହର ଥେକେ ବେଶ ଦୂରେ ନିରିବିଲି ଏକଟା ଜାଯଗା। ସେଥାନେଇ କାବ୍ୟଦେର ବାଡି। ବାଡିର ପାଶ ଦିଯେ ବୟସ ଗେଛେ ବିଶାଳ ଏକ ନଦୀ। ଅନ୍ୟଦିକେ ସବୁଜ ବନ। ସବମିଲିଯେ ବାଡ଼ିଟାର ଆଲାଦା ଏକଟା ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଆଛେ। ବାଡ଼ିର ଉଠୋନ୍ତ ବେଶ ବଡ଼। ଉଠୋନ୍ତେ ଦାଡ଼ିଯେ ସାଯମା ମେଯେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଆର ଭାବଛେ—କାବ୍ୟ ନଦୀର ଧାରେ ଏକା କୀ ଏତ ଖେଳେ? ଏତ କରେ କାବ୍ୟର ଆବୁକେ ବଲି—ଚଳୋ, ଶହରେ ଚଲେ ଯାଇ। ଲୋକଟା ଯାବେ ନା। ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଏକଟା ଲୋକ! ଓର ନାକି ବାବାର ଭିଟାମାୟା ପଡ଼େ ଗେଛେ। ବିଯେର ପରେ ଆମରା ଶହରେ ଛିଲାମ। ଆମାଦେର କୋଳ ଜୁଡ଼େ କାବ୍ୟ ଏଲା। ଆର ଆମାର ଅସୁଖଟାଓ ଏଲା। ଡାଙ୍କାର ବଲଲ, ଆମି ଆର ମା ହତେ ପାରବ ନା। ଆମି ବିଚଲିତ ହଇନି। କାବ୍ୟେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଏକଟା ଜୀବନ ପାର କରା ଯାଇବା କୀ ସୁନ୍ଦର ମେଯୋଟା! ଦୁଃଚିନ୍ତାଯ ପଡ଼ିଲାମ ମେଯୋକେ ନିଯେ। ମେଯୋଟାର ବିପଦେର ଆଶଂକାଯ ଧାମେ ଚଲେ ଏଲାମ। ନିରିବିଲି ଥାକବ।

କାବ୍ୟ ଏସେ ସାଯମାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେଛେ।

- ମା, ମା! କୀ କରୋ?

- କିଛୁ କରାଇ ନା ରେ, ମା। ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ। ଏହି ଆସାର ସମୟ ହଲୋ?

କୋନୋ ଜବାବ ନା ଦିଯେଇ କାବ୍ୟ ଘରେ ଚଲେ ଯାଇ। ମେଯୋଟାର କୋନୋ ଖେଲାର ସାଥି ନେଇ। ଆଗେ ଖେଲାର ଜନ୍ୟ ଶହରେ ବାଢ଼ାଦେର କାହେ ନିଯେ ଯାଓୟା ହତୋ। ଇଦାନୀଂ ତାଓ ହଞ୍ଚେ ନା। ଲୋକଟାର ଶୁଦ୍ଧ କାଜ ଆର କାଜ। ମେଯୋଟାର ଦିକେ କୋନୋ ଖେଲାଇ ନେଇ, ଭାବେ ସାଯମା।

ଏଭାବେଇ ଚଲାଇଲି ଦିନ।

ହଠାତ୍ ଏକ ବିକାଳେ ବେଶ ଦେରି କରେ ବାସାଯ ଫେରେ କାବ୍ୟ। ସାଯମା ରେଗେ ଗିଯେ ବଲଲ, ଏକା ଏକା ଏତ କୀ ଖେଲା କରୋ? ସାଯମାକେ ଅବାକ କରେ ଦିଯେ କାବ୍ୟ ବଲେ, ‘ମା ଆମି ତୋ ଏକା ଖେଲି ନା। ଆମାର କାହେ ଏକଟା ମେଯେ ଆସେ। ନଦୀର ଧାରେଇ ଓର ବାସା ।’

ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ଯାଇ ସାଯମା। ଏ କୀ! ଏକ ମାଇଲେର ମଧ୍ୟେ ତୋ କୋନୋ ବାଡି ନେଇ। ତାହଲେ ମେଯୋଟି ଆସେ କୋଥା ଥେବେ?

- ମେଯୋଟିର ନାମ କୀ ବେ, ମା?

- ନାମ ତୋ ଜାନି ନା, ମା।

ସାଯମା ଜାନେ କାବ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବଲେ ନା। ତାହଲେ କେ

মেয়েটি? না কি মেয়েটা একা থাকতে থাকতে
মানসিক সমস্যায় ভুগছে? বিকালে কামাল এলে
তাকে বলতে হবে।

সন্দেশ মিললেই কাব্য বই নিয়ে বসে। শব্দ করে
পড়ে—

এই ছেলেটা ভ্যাল-ভ্যালেটা
আমাদের বাড়ি যাবি?
এক পয়সার মুড়ি দেব
পেট ভরে খাবি।



এর মধ্যেই বাড়ি ফিরেছে কামাল। সায়মা বলে,
'এই শোনো! কাব্য আজ কী বলছে, জানো?'

কামাল হাতের ব্যাগটা নামাতে নামাতে বলে, কী
বলেছে?

সায়মা খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে শুরু করে। সব
শুনে কামাল বলে, কয়েক দিন যাক; সব ঠিক
হয়ে যাবে।

সায়মা বলে, কাব্যের আবু, শোনো...!

কোনো পাত্তা দেয় না কামাল। যেন এ কোনো
সমস্যাই না। সায়মা তাবে, লোকটা এমন হলো
কেন? আগে তো বেশ ফুরফুরে ছিল।

পরদিন ভোর না হতেই সন্দেশ বানাতে বসে
সায়মা। সন্দেশের কথা বললে, নিশ্চয়ই ওই
মেয়েটা বাড়ি আসবে। মেয়েটার নামও কাব্য
জানে না। কাব্যটা না ভীষণ বোকা।

কাব্যের হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে সায়মা
বলে, 'মা, শোনো। আজ যদি মেয়েটি আসে,
ওকে বাসায় নিয়ে আসবে। ওর জন্য সন্দেশ
বানিয়েছি' কাব্য খুব খুশি হয়ে বলে, 'ঠিক
আছে, মা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

নরম ঘাসে নরম পা ফেলে কাব্য দেয় এক ভো-
দৌড়। আবার ফিরেও আসে এক দৌড়। এসে
বলে, 'মা, ও আসবে না। বরং সন্দেশের বাটিটা
আমাকে দাও, আমি গিয়ে দিয়ে আসি।'

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে কাব্য। সন্দেশের বাটি ওর
হাতে। গোপনে পিছু নিয়েছে সায়মা। খুব ধীরে
ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কাব্য যেদিকে যাচ্ছে
সেদিকে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা
শালিক উড়াউড়ি করছে। কাব্য এগুচ্ছে, সায়মা ও
এগুচ্ছে। কাব্য গিয়ে বসে পড়ল। বাতাসের সাথে
কথা বলছে কাব্য? কই, কেউ তো নেই।

সায়মা খুব কাছে যায় কাব্যের।

- কাব্য, এখানে তো কেউ নেই!

চৰকে উঠে কাব্য।

'মা, তুমি এখানে এলে কেন? মা,
ও তো চলে যাচ্ছে। ও আর আসবে
না, মা।' এই বলে কান্না শুরু করে
দেয়। ভীষণ কান্না। কাঁদতে কাঁদতে
ঘূর্মিয়ে পড়ে সে।

ঘূর্ম থেকে উঠে কাব্য নুপুরের শব্দ শুনতে পায়।
চূড়ির টুংটাং শব্দ। খালি গায়ে লাল প্যান্ট পরা
ওই মেয়েটি। তার নুপুরের শব্দে ঘর মুখর হয়ে
আছে। ভীষণ ভয় করে কাব্যের। চিৎকার করে
উঠে সে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে সায়মা।

- কাব্য, কী হয়েছে?

- মা, ও তোমাকে খুন করতে চায়।
ওর হাতে ছুরি।

আশ্চর্য! কাব্য এসব কী বলছে? ঘরে তো কেউ
নেই। আমাদের কাব্য কি পাগল হয়ে গেল!
বিচলিত হয় সায়মা। তখনই কামাল ঘরে ঢুকে।
দু'হাত দিয়ে কামালকে আকড়ে ধরে সায়মা।

'কাব্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। চলো, ডাঙ্কারের কাছে
নিয়ে যাই। চলো, আমরা এ গ্রাম ছেড়ে যাই।'

কামাল হাতটা ছড়িয়ে নিয়ে বলে, 'সব ঠিক হয়ে
যাবে, সায়মা।'

চিৎকার করে উঠে সায়মা। 'কিছুই
ঠিক হবে না। কিছুই না। তুমি
আমাদের ভালোবাসো না, তাই

না? তুমি পাথর হয়ে গেছ। পাষ্ঠন কোথাকার!

পাষ্ঠন বলতে কামাল খুব আহত হয়। ‘সায়মা, তোমার মাথা ঠিক নেই। তোমাকে অনেকবার বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি।’

‘কী বলতে পারোনি?’ কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে সায়মা।

কামাল নরম হয়ে বলে, ‘তুমি ভুলে গেছ সেদিনটার কথা? শ্রাবণ মাসের তেরো তারিখ। আমরা শহর থেকে ফিরছিলাম। ফিরতে রাত নামলো। জনমানবহীন নদীর বুকে শুধু আমাদের নৌকা। তোমার কোলে কাব্য ঘূরিয়ে পড়েছে। সেদিন ভাগ্য খুবই অপ্রসন্ন ছিল। আকশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। তুমুল বৃষ্টি। আর

ঝড়। আমাদের নৌকা ডুবে গেল। অনেক কষ্টে তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। কাব্যকে আর খুঁজে পাইনি। পরদিন কাব্যের লাশ পাওয়া গেল। লাশ দেখামাত্র তুমি অঙ্গান হয়ে গেলো।’

সায়মা চিৎকার করে উঠল, ‘তুমি চুপ করো। একটা কথাও বলবে না। এ তো কাব্য আমার ঘরে। দিব্যি শুয়ে আছে। আজ ওর পুতুলের বিয়ো।’

- এ সবই তোমার কল্পনা, সায়মা।

সায়মা বিছানার দিকে তাকাল। সত্যিই কেউ নেই। কাব্যের খেলার পুতুল একা পড়ে আছে। সায়মার চোখ দিয়ে অরোরে পানি পড়ছে। অস্পষ্ট স্বরে বলেই চলছে, ‘কাব্য! আমার কাব্য!’



শোলোতে লেখা পাঠাও তুমিও!

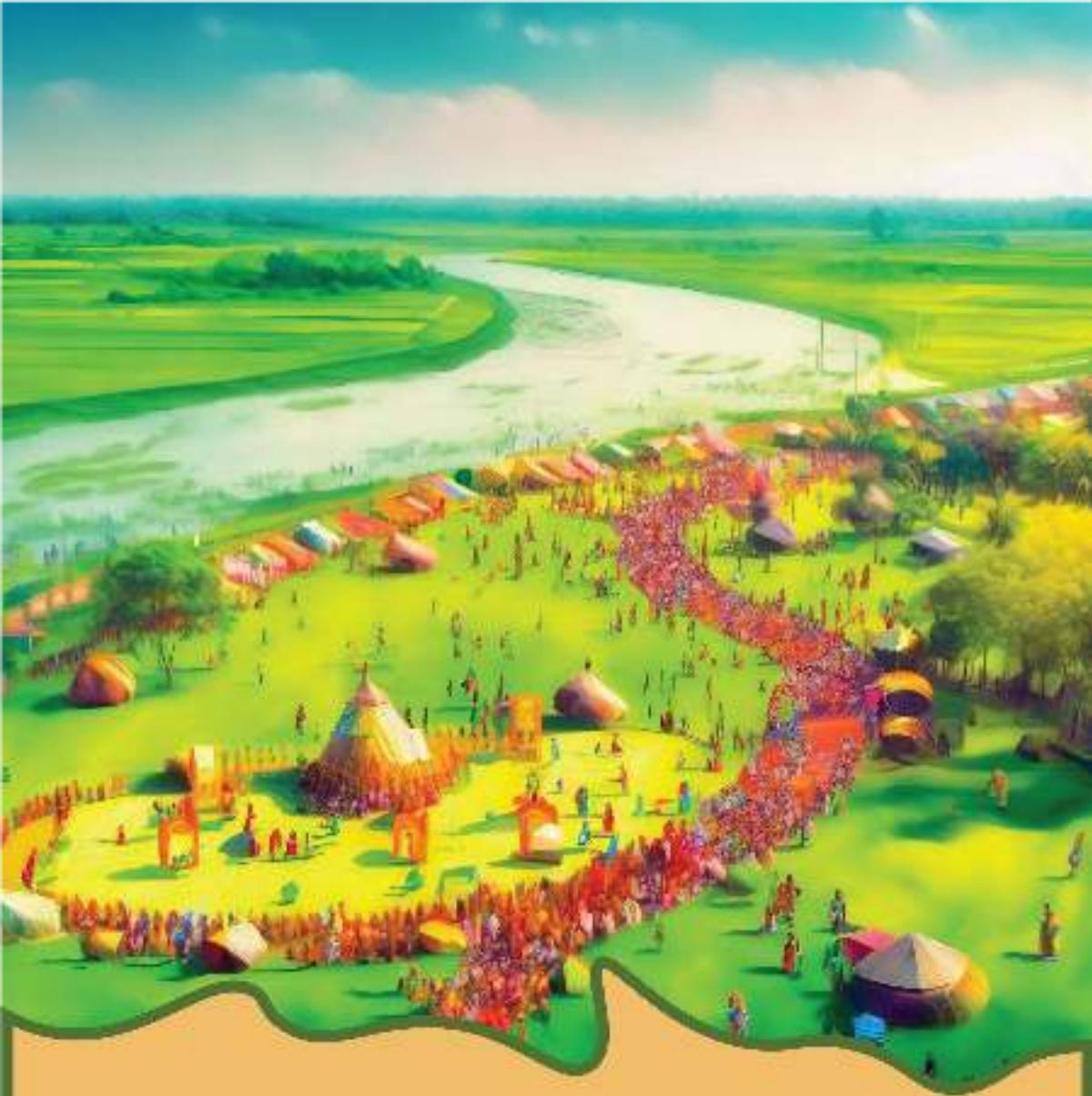


কী? ওপরের লেখাটা পড়ে মন ভার হয়ে আছে? এক্ষুনি মন ভালো করে দিচ্ছি দাঁড়াও।

মোলো ম্যাগাজিনে নিজের লেখা দেখতে চাও? দেরি না করে জলদি পাঠিয়ে দাও আমাদের এই মেইলে editor.sholo@gmail.com। মেইলের সাবজেক্টে লিখবে ‘মোলোর জন্য লেখা’। লেখা পাঠাতে হবে ১৫ জুলাই ২০২৩ তারিখের মধ্যে।

যে যে বিষয়ে লেখা দিতে পারবে :

শুধু ইসলামি লেখা হতে হবে এমন নয়। লিখতে পারো তোমার স্কুল বা কলেজের মজার কোনো ঘটনা, খিলার, ভূতের গল্প, রহস্যগল্প, ব্রহ্মগল্প, ভ্রমণকাহিনি, হোটগল্প, সার্যেল ফিকশন, ছড়া-কবিতা, কমিকস। সেলফ হেল্প, মোটিভেশন, ক্যারিয়ার টিপস, লাইফ হ্যাকস, লাইফ স্কিল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, ট্রিভিয়া... মনে যা চায় লিখতে পারো সেগুলো। যাদের লেখা প্রকাশিত হবে তাদের জন্য মোলো’র পক্ষ থেকে থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।



মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই ও পড়া মুখস্তের মমম্যা

আয়াত



তথ্য হবে সন্ধ্যা সাতটা। শীতের সময়।

আয়ান, নামায আগেভাগেই হয়ে গেছে। নামায পড়ে বই নিয়ে বসলাম। পর্যায় সারণীর প্রথম বিশটি মৌলের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না। আজ দিয়ে তিনি দিন যাবৎ ওই একটা জিনিসই শুধু পড়ছি।

হ্যাঁ মাইগ্রেনের ব্যাথা শুরু হলো। আশ্মুকে বললাম একটু চা দিতো। আশ্মু হ্যাঁ আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলল, ‘তোর ভাইকে পাচ্ছি না। আর তোর এখন চা লাগবে!’

কথাটা শুনে চমকে গেলাম। বিকালেই তো রাহাত (আমার ভাই) নাচতে নাচতে আবুর সাথে মেলায় গেল। আশ্মুকে আবুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, আবু মেলাতেই ওকে খুঁজছে। মামাও তাড়াতড়ো করে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে আশ্মু কানাকাটি শুরু করেছে। এদিকে টেনশনে আমার মাইগ্রেনের ব্যাথা আরও বেড়ে গেল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। খোঁজাখুঁজি করত্বর জানতে আবুকে ফোন দেব ভাবছি, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। আশ্মু হস্তিন্তি করে দরজা খুলতে গেল। এ ঘর থেকে রাহাতের কানার শব্দ শুনতে পেয়ে নিশ্চিত হলাম ওকে পাওয়া গেছে।

গিয়ে দেখি আবু ওকে মারছে। আশ্মু আর মামা ওকে আগলানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর দোষ হলো ক্লাস ফোরে পড়েও কেন আবু-আশ্মু কারোরই ফোন নাস্বার মনে রাখতে পারেন না। আবহাওয়ার করণ অবস্থা দেখে বুবালাম—যদি এক্সুনি গিয়ে পড়তে না বসি, তাহলে বকাবকির তির তীর বেগে আমার দিকে ছুটে আসবে।

কিছুক্ষণ পরই আবু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আশ্মু ছেলেকে আদৰ করতে ব্যস্ত। এবার আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো—ওকে যেন আবু-আশ্মুর ফোন নাস্বার মুখস্থ করাই।

রাতে খাওয়ার পর ওকে নিয়ে আমার ঘরে আসলাম। নাস্বারগুলো বলা শুরু করব এমন

সময় ওর গলার কাতর সুর, ‘আপু, আমি মনে রাখতে পারি না। অনেক চেষ্টা করি, তাও পারি না।’

মেজাজটা অনেক গরম হলেও মনে হলো রাহাত কথাটা ভুল বলেনি। আমিও যে ভুলে যাই না ব্যাপারটা এমন না। কী করা যায়, কী করা যায়... আইডিয়া!

গুগলে সার্চ দিলাম, ‘তথ্য মনে রাখার সহজ উপায়’। একটা লেখার ওপর নজর যেতেই পড়া শুরু করলাম।

‘প্রতিদিন আমরা অনেক তথ্যের সাথে পরিচিত হই। কখনো সেটা হয় অনেক মজার। আবার কখনো বিরক্তিকর। আমরা সচরাচর যে তথ্যগুলো জানতে পারি বা শিখি তা মনে রাখার চেষ্টা করি। আমাদের প্রয়োজনেও আমরা তথ্য মনে রাখি।

দৈনন্দিন হাজার হাজার তথ্যের সাথে পরিচিত হতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ তথ্যই আমরা ভুলে যাই। প্রয়োজনের সময় সঠিক তথ্যগুলো আর মনে পড়ে না। আমরা সব তথ্য একসাথে গুলিয়ে ফেলি। তাই আমাদের শেখা আর জানা জিনিসগুলো মনে রাখার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, যেন আমরা যা শিখি সহজেই তা ভুলে না যাই।

তুমি যদি তোমার শেখা বা জানা তথ্যগুলোর একটা অংশ ধরে রাখতে চাও, তবে তোমাকে বারবার তথ্যগুলো মনে করে সেগুলো বালিয়ে নিতে হবে। নয়তো সহজেই ভুলে যাবে। তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তুমি বারবার তথ্যটির কথা স্মরণ করছ কি না। গরুর জাবার কাটা দেখেছ না? অনেকটা সেভাবে তোমাকে জাবার কাটতে হবে। তো, পুরো ব্যাপারটা কেমন হবে চলো ধাপে ধাপে দেখি।



তোমার শেখা নতুন তথ্যগুলো কোথাও লিখে ফেলো।



পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি যা লিখলে তা পুনরায় পড়ো। শুধু পড়লেই হবে না। যা লিখেছ সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করো। না দেখে মনে করার চেষ্টা করো কী কী পড়েছে।



তুমি যা যা লিখেছ, তা সাধারণ ফ্ল্যাশকার্ডে (স্টিকি নোট ব্যবহার করতে পারো বা কাগজ ছেট করে কেটে বানাতে পারো) পরিণত করো। অর্থাৎ ছেট ছেট কাগজে বা কার্ডে একটা একটা করে তথ্য লিখে রাখো। [ধরো, রাহাত আশুর আবুর ফোন নাম্বার মুখস্ত করবে। সে একটা কার্ডে আশুর ফোন নম্বর লিখল, আরেকটিতে আবুর।]



একদিন পর, পরীক্ষা করো তুমি তোমার ফ্ল্যাশকার্ডগুলো ব্যবহার করে কতটা ভালোভাবে তথ্যগুলো মনে করতে পারছ। এটা নিয়মিত করো। বিশেষ করে, তুমি যখন তোমার দৈনন্দিন কাজগুলো করছ।

ট্যাপ ছেড়ে বালতিতে পানি ভরার জন্য অপেক্ষা করছ? একবার তথ্যগুলো স্মরণ করো। স্কুলের জন্য হাঁচ? পকেট থেকে কার্ড বের করে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নাও। খেলতে মাঠে যাচ্ছ? তথ্যগুলো আবারও মনে করার চেষ্টা করো।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে তোমার বারবার সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর আরেকটা নোট তৈরি করো। সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দাও। তুমি বিষয়গুলো এখনো বুঝে উঠতে পারোনি। হয়তো তাই এই তথ্যগুলো মনে রাখতে পারছ না। এক্ষেত্রে তোমার শিক্ষক বা সহপাঠীর সাহায্য নিয়ে বিষয়টি ভালোমতো বুঝে নাও।



এক সপ্তাহ পর তোমার করা প্রথম নোটটা খুলো। আবার পড়ো। কীভাবে আবার পড়বে? শেখা তথ্য আবার শেখার জন্য তথ্যগুলো না

দেখে লিখো। যদি সব লিখতে পারো, তাহলে তো হয়েই গেল। আর না হলে আবার এক নম্বর ধাপ থেকে শুরু করো।'

আমি এ সবকিছু রাহাতকে পড়ে শুনালাম। আর ওকে এই অনুযায়ী কাজ করতে বললাম। ওর উত্তেজনা দেখে মনে হলো, কতই-না মনে রাখতে পারবে! যদিও আমি জানি ওর পক্ষে শুধু আদর্শলিপির ওই ১, ২ আর অ আ-ই শুধু মনে রাখা সন্তুষ।

একটা কাগজে ওকে নাম্বার দুইটা লিখে দিলাম।

দুই সপ্তাহ পর আবুর আমাকে ডেকে জিজেস করল, ওর উন্নতি কেমন। আমি কেবলই বলতে যাব ওকে দিয়ে হবে না, রাহাত এসে দুটো নম্বরই গড়গড় করে বলে দিল। তখন আবুর থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য আমিও হাসি হাসি মুখ করে থাকলাম... যেন আমি আগে থেকেই জানতাম যে, ও সব পারবে! তবে পরে ওকে ডেকে বললাম, কী করে করলিবে মুখস্ত?

ও আমার ফোন থেকে মনে রাখার ওই ধাপগুলো বের করল। আর ওর বানানো নোট, ফ্ল্যাশকার্ড, খাতা সব এনে আমাকে দেখিয়ে বলল, ‘এইভাবে’।

ওর ওপর প্রক্রিয়াটার প্রভাব দেখে আমি নিজেও সেটা করা শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর মৌখিক পরীক্ষা ছিল শফিক স্যারের। স্যার খুব রাগী মানুষ। দেখলেই ভয়ে হাত-পা জমে যাব। স্যার আমাকে পর্যায় সারণীর প্রথম ১০টা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলতে বললেন। আমি সুন্দর করে সব বলে দিলাম! স্যার বেশ প্রশংসন করলেন।

হাসি আমার দু' কানে গিয়ে ঠেকল। টিফিনের জন্য আবুর যে টাকা দিয়েছিল, সেখান থেকে রাহাতের জন্য একটা মাল্টা কিনলাম। মাল্টা ওর খুব পছন্দ। হাজার হোক সে মেলাতে হারিয়ে গিয়েছিল বলেই তো আমার এই মনে না থাকার সমস্যা দূর হলো!



বালিতে লেখা চতু

সাদির সারমিন

চেট থেকেই আমি খুব আবেগী। কারও করি। আবার আমার সাথে কেউ একটু খারাপ ব্যবহার করলেও সারাদিন মন খারাপ করে বসে থাকি। আমার মন খারাপের সময় রূবি আমার সাথে থাকে। ও আমার সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় হয় বছরের।

হাই স্কুল পার করে আমরা এক প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হলাম। আমি আব রূবি একই বেঞ্চে বসতাম প্রত্যেকদিন। প্রথম দিনই আমাদের কেমিস্ট্রি টিচার এসে বলে দেন, এক বেঞ্চে তিন জন বসতে হবে। এরপর থেকে বেঞ্চের মাঝে আমি, আমার ডান পাশে রূবি আব বামে বসত সুমি। সুমি আমাদের কলেজের নতুন বান্ধবী।

আমরা একসাথে কলেজে আসতাম, যেতাম। টিফিন শেয়ার করতাম, গ্রুপ স্টাডি করতাম। কলেজ লাইফটাতে একসাথে অনেক মজা করেছি।

পড়াশোনা ভালোই চলছিল। জুন মাসের শেষে কলেজে বেতন দেওয়ার ডেট। আববুকে বেতনের কথা বললাম। আববু কিছু না বলেই চলে গেল। পড়ে আশু আমার ঘরে এসে বলল, ‘তোর আববুর অফিসে কী নিয়ে যেন বামেলা চলছে। এই মাসের বেতনটা দেরিতে হবে। তুই তোর কলেজের স্যারদের সাথে একটু কথা বলে দেখ তো, ম্যানেজ করতে পারিস কি না।’ আমাকে সরাসরি বলতে হয়তো আববু অস্বস্তিবোধ করছিল, তাই আশুকে দিয়েই বললাম। আমি আশুকে বললাম আববুকে বলতে, যেন টেনশন না করো।

পরদিন কলেজে গিয়ে রূবির থেকে কিছু টাকা ধার চাইলাম। ও বলল, এই মাসে ওরা ঘুরতে যাবে। তাই আমাকে এখন টাকা দিতে পারবে না। সুমি আমার কথা শুনে বলল, ও দিয়ে দেবে। আমি সুমির থেকে টাকা নিয়ে ওই মাসের বেতন পরিশোধ করলাম।

রুবি তিন দিনের ট্যুর শেষ করার পর কলেজে আসলো। ক্লাস শুরু হতে এখনো দেরি। তাই ওর গল্প শুনতে বসলাম। ও কোথায় কোথায় ঘূরল।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর খেয়াল করলাম, আমি কলম আনতে ভুলে গেছি। কালকেই নতুন কলম কিনলাম। কোথায় যে হারালাম! রুবি ওর একটা কলম এগিয়ে দিল। কয়েকটা ক্লাস শেষে টিফিনের সময় রুবি বলল, ঘূরাঘূরির জন্য ও অনেক ক্লাস্ত হয়ে গেছে। আমি যেন ওর অ্যাসাইনমেন্টগুলো করে দিই। আমাকে কাগজ দেবে এমন সময় সুনি বলল, ‘সামনে তো পরীক্ষা। সাধিকা এতগুলো করতে গেলে ওর তো পড়াই হবে না।’ আমি ওর কথায় পাতা না দিয়ে রুবির থেকে কাগজগুলো নিয়ে নিলাম। রুবি একটা ক্লাস না করেই চলে গেল। রুবি যেতেই সুনি আমার মাথায় জোরে একটা গাঢ়ি মেরে বলল—

: এই গাঢ়ি, তুই ওকে হেঁস করতে গেলি কেন?

: ও যে আমাকে তখন ক্লাসে কলম দিয়ে হেঁস করল।

: ওর ওই ছোট হেঁসের কথা তোর মনে আছে, আর ও যে তোকে বিপদে দেখেও ঘূরতে চলে গেল সেইটা তোর মনে নেই?

: তাহলে শোন, তোকে একটা গল্প বলি।

দুই বন্ধু মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে বাগড়া লাগল। এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে চড় মেরে বসল। চড় খাওয়া বন্ধু কিছু না বলে পাশে থাকা বালিতে লিখল, ‘আজ আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমাকে চড় মেরেছে।’

এরপর ওরা আবার হাঁটতে থাকল। হাঁটতে হাঁটতে যে বন্ধু চড় খেয়েছিল সে হঠাৎ চোরাবালিতে পড়ে গেল। কিন্তু তার বন্ধু তাকে বাঁচিয়ে দিল। চোরাবালি থেকে উঠে আসার পর সে একটা পাথরে লিখল, ‘আজ আমার সেরা বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।’

যে বন্ধু চড় মেরেছিল আর তাকে বাঁচিয়েছিল, সে

তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি তোমাকে আঘাত করার পর তুমি বালিতে লিখেছিলো। আর এখন পাথরে লিখছ কেন?’

অপর বন্ধু উত্তর দিল, ‘যখন কেউ আমাদের আঘাত করে তখন আমাদের তা বালিতে লিখে রাখা উচিত। ক্ষমার বাতাস যেন এটিকে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু যখন কেউ আমাদের উপকার করে, তখন আমাদের অবশ্যই তা পাথরে খোদাই করে রাখা উচিত। যেন কোনো বাতাস তা মুছে ফেলতে না পারে।’

এবার বল, তুই কী বুঝালি?

বুঝালাম তো অনেক কিছুই বে। আসলেই, ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ। মানুষ একেবারে নিখুঁত হতে পারে না। মন্দ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে ভালো বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা উচিত আমাদের।

**‘লোকেদের প্রতি কোমলতা
করবে, কঠোরতা করবে না;
তাদের সুখবর দেবে, ঘৃণা সৃষ্টি
করবে না। পরম্পর একমত
হবে, মতভেদ করবে না।’**

[বুখারি, আস-সহীহ, হাদিস নং : ৩০৩৮]



মৌমাছির জীবনচক্র

মাহফুজ আলাম দিপু

প্রকৃতি যে কত বৈচিত্র ধারণ করে রেখেছে, তার ইয়ন্তা নেই। এত বৈচিত্রের মধ্য থেকে কেন মৌমাছি নিয়ে কথা বলতে হবে? অবশ্যই এর কারণ আছে। সমগ্রতীয় অন্যান্য জীবের চেয়ে মৌমাছি আলাদা। এর রয়েছে বিশেষ কলোনি ব্যবস্থা, যেখানে রয়েছে নির্দিষ্ট আচার-ব্যবহার, বাচনভঙ্গি ও গোত্রভেদ। শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের অন্যতম এক নির্দেশন হলো মৌমাছির জীবনচক্র। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলে আল্লাহ তাআলা মৌমাছির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও মধুর গুণাগুণ সম্পর্কেও কুরআনে আয়াত এসেছে। মধু সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু মৌমাছির বিচিত্র জীবনচক্রের কথা অনেকেরই অজানা।

মৌমাছি সাধারণত গাছের উচু ডালে বাসা বানিয়ে থাকে। আগে ধারণা করা হতো, মৌমাছির একটি

বাসা বা কলোনিতে দুই ধরনের মৌমাছি থাকে। পুরুষ মৌমাছি বাসা নির্মাণসহ সব ধরনের কাজ করে থাকে আর স্ত্রী মৌমাছিরা শুধু বাচ্চা উৎপাদন করে। কিন্তু এসব ধারণা পালটে যায় ১৯৭৩ সালের পর।

১৯৭৩ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ভন-ফ্রিশ মৌমাছির জীবনযাপন নিয়ে বিস্তুর গবেষণা করেন। নোবেলজয়ী এই গবেষক লক্ষ করেন, মৌমাছি আসলে দুই প্রকার না; বরং তিনি প্রকার। পুরুষ, স্ত্রী এবং আরেক প্রকারের মৌমাছি যারা লিঙ্গভেদে মহিলা, কিন্তু প্রজননে অক্ষম। এদেরকে তিনি নাম দেন শ্রমিক মৌমাছি বা ‘Worker bee’। মূলত এই শ্রমিক মৌমাছিরাই যাবতীয় কাজ করে। অন্য দিকে স্ত্রী মৌমাছির কাজ সন্তান প্রসব করা। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করে পুরুষ মৌমাছি। একটি বাসা বা

কলোনিতে একটিমাত্র রানি থাকে। এক রাজ্য যেমন একজন মাত্র রাজা থাকে এবং বাকিরা সবাই প্রজা হিসেবে তার আনুগত্য করে, ঠিক তেমনি সবাই রানি মৌমাছির আনুগত্য করে।

একমাত্র রানি মৌমাছি ডিম পাড়ার ক্ষমতা রাখে। একটি রানি মৌমাছি দিনে প্রায় ২০০০ ডিম পাড়তে পারে। মৌচাকে ঘড়ভূজাকৃতির ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়, এর মধ্যেই মূলত রানি মৌমাছি ডিম পাড়ে। এই প্রকোষ্ঠগুলো পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সকল কিছু করার দায়িত্ব শ্রমিক মৌমাছিদের। রানি মৌমাছি তার ইচ্ছামতো প্রকোষ্ঠ বেছে নেয়। কোথাও বিনু পরিমাণ ময়লা থাকলে, সে সেখানে ডিম দেয় না।

রানি মৌমাছি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের খোপগুলোতে নিষিক্ত ডিম এবং অপেক্ষাকৃত বড় আকারের খোপগুলোতে অনিষিক্ত ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে লার্ভা বেরিয়ে বড় হয়ে কর্মী মৌমাছি হবে এবং অনিষিক্ত ডিমগুলো থেকে লার্ভা বেরিয়ে বড় হয়ে হবে ড্রোন অর্থাৎ পুরুষ মৌমাছি।

মৌচাকে মৌমাছিদের জীবনব্যবস্থাকে একটি মনুষ্য রাজতন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। এখানে প্রয়োজন অনুসারে প্রজাদের বিদ্রোহও সংঘটিত হয়। একাধিক রানি যদি মৌচাকে বড় হতে থাকে, তবে সবার আগে যোটি পূর্ণাঙ্গ হবে, সেটি অন্যগুলোকে মেরে ফেলে নিজে রানি হবার আশায়। রানির যদি জীবনসংশয়ের ভয় থাকে, কর্মী মৌমাছিরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে হলেও তাকে রক্ষণ করবে।

এর উদাহরণ মেলে শীতকালে, রানির যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য তাকে কর্মীরা ধিরে ধিরে একটা উষ্ণ আবরণের মতো তৈরি করে রাখে। একটি মৌচাকে রানি মৌমাছি হলো প্রজননযন্ত্র। কেননা এটিই একমাত্র ডিম পাড়তে সক্ষম উর্বর মৌমাছি। সাধারণত একটি রানি

মৌমাছি সাত বছরের মতো বাঁচতে পারে। তবে কর্মীরা যদি প্রয়োজন মনে করে, রানিকে মেরে নতুন রানি নিরোগ দিতে পারে। রানি মৌমাছি যদি ডিম পাড়তে অক্ষম হয়, কিংবা ডিম পাড়ার পরিমাণ কমে আসে, সবকিছু বিবেচনাতে রেখেই কর্মীরা রানিকে প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।



মধুর কিছু উপকারিতা -

- * রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করে।
- * হজমে সহায়তা করে।
- * কোষ্টকার্টিন্য দূর করে।
- * দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।
- * তারুণ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এখন আসি আরও মজার একটি বিষয়ে। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। এ জন্য তাদের কলোনি ছেড়ে দূরে যেতে হয়। মৌচাকের কর্মী মৌমাছিরা খাদ্য সংগ্রহ করে। সাধারণত মৌচাকে দুই ধরনের কর্মী মৌমাছি দেখা যায়। এরা হলো খাদ্য সন্ধানী কর্মী মৌমাছি বা স্কার্ট এবং খাদ্য সংগ্রাহক কর্মী মৌমাছি বা ফোরেজার। খাদ্য সন্ধানী মৌমাছিরা কোথায় ফুলের মধু রয়েছে, তা সন্ধান করে। খাদ্যের সন্ধান পেলে এরা মৌচাকে ফিরে এসে বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে অন্য মৌমাছিদের সেই খাদ্যের উৎস সম্পর্কে তথ্য জানায়। এই নাচকে মৌন্ত্য বলে। মৌন্ত্যের সময় প্রতি সেকেন্ডের জন্য খাদ্য উৎসের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মিটার হিসেবে তারা প্রকাশ করে। খাদ্যের সন্ধান পেলে কর্মী মৌমাছিরা মৌচাকের সামনে ইংরেজি ‘৮’

অক্ষরের ঘতো একপ্রকার নাচ করে।

বিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিশ সর্বপ্রথম মৌলাছি
ন্ত্যের অর্থ আবিষ্কার করেন। আর এর জন্যই
তিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পৰস্কার পান।

ফোরেজার মৌমাছিরা এরপর রানির অনুমতি
নিয়ে সেই ফুলের কাছে পৌঁছায় এবং মধু সংগ্রহ
শুরু করে। মধু সংগ্রহ করা শেষে তারা আবার
কলোনিতে ফিরে আসে।

এখানেই শেষ নয়। তারা কলোনিতে ফিরে আসলে তাদের জন্য কিছু মৌমাছি অপেক্ষা করে। এদেরকে গার্ড মৌমাছি বলে। এরা মধুর শুনি পরীক্ষা করে দেখে শুধু ভালো মানের মধু সংগ্রহ করা মৌমাছিকেই ভেতরে ঢুকতে দেয়। বাকিদের সেখানেই মেরে ফেলে! কী নিষ্ঠুর, তাই না? অনেক সময় দেখা যায়, মৌচাকের নিচে কিছু মৌমাছি পরে থাকে; এটা তার অন্যতম কারণ।

একসময় রানি মৌমাছিটি বৃদ্ধ হয়ে ডিম পাঢ়ার
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন শ্রমিক মৌমাছিরা
তাকে ঘিরে ধরে এবং অসংখ্য মৌমাছি নিলে
একটি বলের মতো আকার তৈরি করে। এতে
করে অসহণ্য তাপের কারণে রানি মৌমাছিটি
মারা যায়। এরপর আবার নতুন রানি নির্বাচিত
হয়। কী অঙ্গত, তাই না?

ତଥାପ୍ରକାଶ

- ↳ Roar Media
↳ Wikipedia (en)



ଆହୁର ଗାଥାମେ ଏହାର ଆପାତ । ଶିଳ୍ପୀ ଗାନ୍ଧି କିମ୍ବା ବ୍ରଜାମାର ଏହାର ଭାଲୁ କୁଳର ମହାନ୍ତିର ଦେଖିବାରେ ଏହାର ଆପାତ ଆହୁର ଗାଥାମେ ଏହାର ଆପାତ ।

अन्यान्य दैवित विषयों के साथ जुड़ी हुई वह विषयों का अध्ययन भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

[fb.com/mishbadahfragrance](https://www.facebook.com/mishbadahfragrance)
WhatsApp: 01316589661



হোস্টেলের
এলোমেলো
দিনগুলো সাজিয়ে নাও

আসাদুল্লাহ আল গালিব

গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার জন্য হোক কিংবা
জাতির মেরদণ্ড গড়ার জন্যই হোক,
পড়াশোনার জন্য আমরা অনেকেই অনেক কষ্ট
করি। অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করি, ত্যাগ
করি। তা ছাড়া মনীষীরা তো বলেই গিয়েছেন—
ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ!

তাই সুরের জন্য কিছু ত্যাগ আসলেই করা
উচিত। পড়াশোনার জন্য আমাদের সেরকমই
একটি ত্যাগ হলো, বাড়ির আয়েশী জীবন ছেড়ে
হোস্টেলের কষ্টের জীবনের সাথে সন্ধি করা।

হোস্টেল লাইফ কিছুটা কষ্টের হলেও,
ছাত্রজীবনের বেশ আনন্দদায়ক কিছু মুহূর্ত
উপভোগ করা যায় হোস্টেলেই। নতুন নতুন
হোস্টেলে আসার পর কিছুদিন মন খারাপ
থাকে। বারবার বাড়ির কথা মনে পড়ে, বাবা-
মায়ের কথা মনে পড়ে। এই খারাপ লাগা থেকে
মনের মাঝে শূন্যতা তৈরি হয়। আর শূন্যতা
থেকে মাথা গজাতে শুরু করে নানা ধরনের
জটিলতা। পড়াশোনায় খেই হারিয়ে ফেলা,
অহেতুক আড়ডায় সময় নষ্ট করা, এলোমেলো
দিনরাত্রি, হারাম রিলেশন, মাদকাসক্রি ইত্যাদি
অনেক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে অনেকেই।

ভাইয়া ও আপুরা, তোমাদের অনেকেই হয়তো
হোস্টেলে বা মেসে থাকো। লম্বা সময় হোস্টেলে
আর মেসে থাকার অভিজ্ঞতা আছে বলে বাবা-
মাকে ছেড়ে থাকাটা কতটা কষ্টের তা আমি বুঝি।
সুধারণা রাখি—হোস্টেলের ছকে বাঁধা জীবনে
ছাত্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা সুন্দরভাবেই
পার করছ তোমরা। তবুও ‘বড় ভাইয়া’ হিসেবে
অল্প কিছু রিমাইন্ডার দিয়ে যাই, যেন কখনো
শয়তানের ফাঁদে পড়ে তোমাদের ছাত্রজীবন
নষ্টজীবন না হয়ে যায়।

রিমাইন্ডারগুলো হোস্টেলের ছাত্রদের কিছু
কমন সমস্যা নিয়ে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা
অনিষ্টাকৃতভাবেই এসব সমস্যার কাছে
নিজেদেরকে শর্তহীন বন্ধক দিয়ে দেয়! এতে

করে প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রাটাও একসময় হারিয়ে
যায় খেই হারানোর শ্রেতে! তাই তোমরা এ
বিষয়গুলো খেয়াল রেখো।

১ স্বাধীনতা মানেই উদাম ঘুরাঘুরি নয়

হোস্টেলে বা মেসে উঠার পর সর্বপ্রথম যে
ব্যাপারটার সাথে ছেলেমেয়েরা পরিচিত হয়, তা
হলো উদাম স্বাধীনতা। স্কুল বা কলেজের সাথে
সরাসরি সম্পর্ক না হলে এসবে কোনো ধরনের
জবাবদিহিতা থাকে না। খাঁচা থেকে মুক্তি
পাওয়া পাথির মতো এলোমেলো উড়ে বেড়ায়
সবাই। যেই পড়াশোনার জন্য বাবা-মাকে ছেড়ে
হোস্টেলে আসা, সেই পড়াশোনা তখন ডুকরে
ডুকরে কাঁদে। রেজাল্টের অবস্থা তো বারোটা
বাজার উপক্রম হয় তখন।

এমনটা করা যাবে না। লাগামহীন স্বাধীনতায়
লাগাম পরাতে হবে। উদাম ঘুরাঘুরি না করে
সুরোধ বালকের মতো পড়াশোনায় মনোযোগ
দিতে হবে।

২ ‘অসামাজিক’ হও

হোস্টেলের এলেবেলে জীবনে আরেকটা সমস্যা
দেখা দেয়। নতুন নতুন হোস্টেলে এসে অনেকেই
অতিরিক্ত সামাজিক হয়ে যায়। পড়াশোনা বাদ
দিয়ে রুমমেটের সাথে অপ্রয়োজনীয় গল্পে
মেতে উঠে। অনেক সময় দেখবে, পাশের রুম
থেকে কেউ কেউ গল্প করার জন্য আসতে
পারে। এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। পড়ার সময়
কেউ গল্প করতে আসলে ইঙ্গিতে বুবিয়ে দেবে
যে, তুমি বিরক্ত হচ্ছ। ইশারায় কাজ না হলে,
বিনয়ের সাথে বলে দেবে যে, তুমি এখন পড়তে
বসবে।

যেই ‘সামাজিকতা’ তোমার পড়াশোনার
ব্যাঘাত ঘটায়, সেই সামাজিকতায় সামাজিক
হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এসব ক্ষেত্রে তুমি
‘অসামাজিক’ হও। ঠিক আছে?

খাও যদি খাবার একসাথে

পড়ার সময় গল্প-গুজবেনা জড়িয়ে ‘অসামাজিক’ হলেও, অন্যান্য সময়ে সামাজিকতা রক্ষা করে চলবে। বিশেষ করে খাবার সময়ে। চেষ্টা করবে রুমের সবাই একসাথে খেতে। মাঝেমধ্যে একজনের খাবার আরেকজনকে শেয়ার করলেও সম্পর্ক মজবুত হয়। কখনো যদি খাবার একটু কম থাকে, দেশ্তে ভাগাভাগি করে খাবে। এতে সম্পর্কের হাদ্যতা বাঢ়ে।

খাবার কম আছে দেখে তুমি আগেভাগে খেয়ে নিলে পেট পুরে, পরে একজন না খেয়ে থাকল, এমন যেন না হয়। হাদ্বিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে খেলো; কিন্তু তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকল।’^[১]

অনলাইনে অসময়ে

আরেকটা কমন সমস্যা হচ্ছে, অনলাইন আসক্তি। এটাতে অবশ্য শুধু হোস্টেলের দুরস্ত ছেলেপেলেই নয়, বাবা-মায়ের সাথে থাকা নাদুসন্দুস ছেলেমেয়েরাও আসক্ত হয়। অনলাইন আসক্তি করাতে হবে। এখন তো স্কুল-কলেজে অফলাইনেই ক্লাস হচ্ছে। তাই তোমাদের মতো যোলোদের অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাজ থাকে না বললেই চললো। তাই অপ্রয়োজনে অনলাইনে সময় নষ্ট কোরো না।

অনলাইন আসক্তি বা ক্রিন-আসক্তির কারণে তোমার স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই অনলাইন থেকে বিরতি নিতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।

পড়াশোনায় হও নিয়মিত

হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের আরেকটা কমন সমস্যা হলো, পড়াশোনায় অনিয়মিত হয়ে

[১] বুখারি, আল-আদা'বুল মুফরাদ, হাদিস নং: ১১২

পড়া। দিনের পর দিন নিঃস্থার্থ আড়তাবাজিতে পড়াশোনার সাথে সাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। জমতে জমতে উহুদ পাহাড় সমান পড়া জমে যায় পরীক্ষার আগে। সরিয়া ফুল ছাড়া চোখে আর কিছুই দেখা যায় না তখন।


শোনো ভাইয়া ও আপু, তোমরা কৌশলী হও। মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সাথে একটু-আধটু আড়তাবাজি করো, সমস্যা নেই। কিন্তু পড়াশোনার সাথে ব্রেকআপ করে নয়। পড়াশোনার সাথে রিলেশন কন্টিনিউ করতে হবে।

খুব বেশি পড়তে হবে, এমন না। প্রতিদিনের ক্লাসের পড়াটা পড়ে নিলেই হবে। তাহলে আর পরীক্ষার আগের রাতে সরিয়া ফুল দেখতে হবে না। গোলাপ ফুলও দেখতে পারবে!

দিনকে সাজাও রুটিনের সাজে

এলোমেলো কোনো কিছুতেই বারাকাহ থাকে না। হাদ্বিসে আছে—আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। ছাত্রজীবনের একটা সৌন্দর্য হচ্ছে, রুটিনমাফিক পড়াশোনা করা। শুধু পড়াশোনা না, দিনের সবগুলো কাজ রুটিনে সাজিয়ে নিলে দিনগুলো অনেক সুন্দর হয়ে যায়। হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের তো এ ব্যাপারে বেশ দুর্নাম আছে। তারা না কি প্রচণ্ড অগোছালো। আশা করি, তোমরা এসব দুর্নামের দাঁতভাঙা জবাব দেবে। প্রত্যেকটা দিনকে রুটিনের সাজে সাজিয়ে নেবে। দেখবে, সব কাজে কেমন বারাকাহ পাচ্ছ, ইনশাআল্লাহ।

নিশি রাতে বইয়ের সাথে

অনেকের একটা বদ্ব্যাস আছে। সারাদিন, এমনকি সন্ধ্যায়ও পড়তে বসে না। বইয়ের সাথে তাদের প্রণয় হয় নিশি রাতে। অথচ পড়াশোনার জন্য এই সময়টা অপেক্ষাকৃত কম প্রোত্ত্বিত।

আর রাত জেগে পড়াশোনা করে নিশাচর প্রাণী
হলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে।
তাই নিশি রাইতে বইয়ের সাথে প্রণয়ের অভ্যাস
বাদ দাও। পড়াশোনার জন্য প্রোডাক্টিভ সময়
বেছে নাও।

ঠুমি হবে সকাল বেলার পাখি

কেউ রাত জেগে আড়াবাজি করে সকালে
ঘুমায়। কেউ আবার গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা
করে সারা সকাল ঘুমায়। এটা মোটেই ভালো
অভ্যাস নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, রাতে দ্রুত
ঘুমিয়ে সকালে দ্রুত জাগা। তুমি হবে সকাল
বেলার পাখি। সৃষ্টিমাতা জাগার আগেই তুমি
জেগে উঠবো। তবেই না ফুলের বনে ফুল ফুটাতে
পারবে, অঙ্ককারে আলো জালাতে পারবে।

তা ছাড়া পড়াশোনার জন্যও সকাল বেলা
সর্বোত্তম সময়। সারাদিনের মাঝে সবচেয়ে
প্রোডাক্টিভ সময় হলো সকাল বেলা। এই সময়ে
সকল কাজে বারাকাহ পাওয়া যায়। এ সময়ে
পড়লে দেখবে, অল্প সময়ে অনেক পড়া আয়ত্ত
করতে পারছ।

প্রেমের মরায় তুমি ডুবো না

বয়ঃসন্ধিকালের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো,
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করা।
চারপাশে বন্ধুদেরকে হারাম প্রেমের অলিগলিতে
ঘূরতে দেখে নিজেকে দমিয়ে রাখা বেশ কষ্টকরই
বটে। হোস্টেল লাইফে সমস্যাটা আরও প্রকট
আকার ধারণ করে। দেখা যায়, ক্রমেট হারাম
রিলেশনে জড়িয়ে আছে; আর গার্লফ্রেন্ড বা
বয়ফ্রেন্ড নামক বস্তুর সাথে মোবাইলে সারাক্ষণ
ফুটুর ফুটুর করছে। এসব দেখে নিজেকে দমিয়ে
রাখতে হয়তো অনেক কষ্ট হবে। এই কষ্টটা
মেনে নিতে হবে!

শোনো ভাইয়া ও আপু, এই অশান্ত ফিতনার
সময়ে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারলে সাওয়াবও
বেশি পাবো। আর সময় হলে জীবনের এক
সবুজ সকালে আল্লাহ তোমার জন্য ঠিকই চক্ষু
শীতলকারী কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। সে পর্যন্ত
নিজেকে পবিত্র রাখো।

আরেকটা বিষয় মন দিয়ে শুনো। একটা ছেলে
বা মেয়ের সুন্দর ছাত্রজীবন ধ্বংস হওয়ার জন্য
একটা হারাম রিলেশন-ই যথেষ্ট। অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের পেছনে কী
পরিমাণ সময় যে নষ্ট হয়, তা তো বলার অপেক্ষা
রাখে না। আর বেশিরভাগ প্রেমেই বিভিন্ন সময়
মন ক্ষয়কষি, অভিমানী ঝগড়া, সন্দেহের
চোরাবালি জীবনের আনন্দ একদম মাটি করে
দেয়। পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাই
প্রেমের মরায় নিজেকে ডুবিয়ো না। সবর করো।
প্রেমের গলি-ঘুপচি নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য
পড়তে পারো লস্ট মডেস্টির ‘আকাশের ওপারে
আকাশ’ বইটি।

বালিশে মিলেমিশে

যতই দিন যাচ্ছে একের-পর-এক ফিতনা
আমাদেরকে অঙ্গোপাসের মতো জড়িয়ে
ধরছে। আজকাল এমন কিছু ফিতনা মাথাচাড়া
দিয়ে উঠেছে, যেগুলো এক যুগ আগে আমরা
কল্পনাও করিনি। সেরকমই একটি ফিতনা হলো
সমকামিতার ফিতনা। যেই অপরাধের জন্য
আল্লাহ আয়া ওয়া জাল্লা লৃত আলাইহিস
সালামের জাতিকে নজরবিহীন আয়াব দিয়ে
ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই অপরাধকে আজ
ইবলীসের বাহিনী উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের
চক্রান্ত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তোমাদের মতো
'যোগোরাও'।

হোস্টেল-মেসেও ইদানীং এই ফিতনা ছড়িয়ে
পড়েছে। অনেক সময় তোমরা ক্লোজ ফ্রেন্ডের
সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো। এ ক্ষেত্রে

[২] বিস্তারিত জানতে পড়ো - ছাত্রজীবন সুখের জীবন!
লিংক - <https://tinyurl.com/studentlifehappylife>

অবশ্যই কিছু আদব মেইনটেইন করবো। যেমন-একই কস্বল বা কাঁথার নিচে ঘুমাবে না। এ ব্যাপারে হাদিসে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আছে।

এ ছাড়া কারও মাঝে সমকামী আচরণ দেখতে পেলে (ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে) তাকে বোঝাতে হবে। তার মাঝে পরিবর্তনের লক্ষণ না দেখলে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। একই ক্রমে থাকা বাদ দিতে হবে। বাবা-মা, শিক্ষক বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কোশলে জানাবে।

🚫 আগুনের সাথে সন্ধি

হোষ্টেল লাইফে ছেলেমেয়েরা যে সমস্যাটাতে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ে, তা হলো সিগারেটের আগুনের সাথে সন্ধি। কেউ শখের বসে এই বদভ্যাসের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়, কেউবা জীবনের বিভিন্ন না পাওয়ার বেদনা ভুলে থাকার জন্য আগুনের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়।

‘এক টানে দুই টানে কিছু হয় না’ ভেবে শুরু করা এই বদভ্যাস অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছ সিগারেটের আগুন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। সিগারেটের আগুনের প্রেম একে টেনে নিয়ে যায় মাদকের

তরল নেশা পর্যন্ত। মৃত্যুর আগেই মরণ হয় অসংখ্য সুন্দর প্রাণের। ধৰ্মস হয় ছাত্রজীবন, কবর রচিত হয় বাবা-মায়ের স্বপ্নের।

ভাইয়া ও আপুরা, ভুলেও কখনো আগুনের সাথে সন্ধি করবে না। এই আগুন শুধু দুনিয়াতেই পোড়ায় না, আখিরাতে জাহানামের আগুনেরও বন্দোবস্ত করতে থাকে।

ভাইয়া ও আপুরা, ওপরের এই সমস্যাগুলোর কাছে কখনোই অসহায় আত্মসমর্পণ করবে না। বরং তোমরা হবে পরবর্তীদের জন্য আদর্শ ভাইয়াপু। হোষ্টেলের প্যারামায় লাইফকে একটি সুন্দর ছাত্রজীবনের অগুটক বানিয়ে নাও। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করো। পৃথিবীকে বদলাতে চাইলে সব মানুষকেই আগে বদলাতে হবে, এমন না। তবে যারা পৃথিবী বদলানোর কাজ করবে, তাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে আগে।

তুমি কি সাহিত্যের বসে থাকতে চাও? না কি খেলতে চাও একেবারে স্টাইলিং পজিশনে?



স্মৃতিচারণ

ওমর ইবনে সাদিক



আমার বয়স যখন সতেরো-সন্ধ্যার জরুম বর্ষদামাটিতে ঘোড়ার মতো দ্রুতবেগে ঝঙ্গলের পাশ
দিয়ে ছুটে যেত আমার ফালিঙ্গ সাইকেল। দৈরাচারী শাসকের মতো ঠাড়িয়ে যেতাম বালি,
পাথর আর কড়ই গাছের পাতাগুলোকে। দুপাশে কিম্বাল গাছগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারকে
টেনে নামিয়ে আজতো একস্মত মাটিতে। যুধির শিশুর মাঝে ব্যাঙগুলো ডেকেই যেত। পুরো
ঝঙ্গল জুড়েই সংসার পেতে রেখেছিল পোকামাকড়ের দল। সন্ধ্যার মুজসাজ-নিষ্ঠসন্ধ্য
ঝঙ্গলস্টোর পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হতো, এই বুধি কেউ টেনে নিয়ে গেল! আয়াতুল
কুরসি পড়ে ঘাড়ের রং শক্ত করে সাইকেল নিয়ে দিতাম এক টা...ন!

ছোটবেলার কথা ভাবলে খুব হাসি পার এখন। কী বোকাটাই ন ছিলাম! এখন অবশ্য ঝঙ্গলস্টো
এত ডয় লাগে না আমার। লাগবে কী করো সতাঙ্গ বছর হলো। এক মাগরিবের ওষাঙ্গে
আমাকে এখানে পুঁতে দিয়েছে আমার নিজের লোকেরই।



ମୁଖାଚାରୀ

ହାସାନ ଆଲୀ

ଧରୋ, କ୍ଳାସେ ସ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ କରଲା। ତୁମି ଉତ୍ତର
ଜାନୋ। କିନ୍ତୁ ବଲତେ ଚାହୁଁ ନା। କାରଣ,
ତୋମାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହଲେ ବନ୍ଧୁରା ହାସାହାସି କରବେ।
ଠିକ ହଲେ ଆବାର ଆଁତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବଲେ ପଚାରେ।
ତୁମି ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦେଓୟାର ସମୟ ସବାଇ ତୋମାର
ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକବେ—ଏଟାତେ ତୋମାର ଅସ୍ଵନ୍ତି
ହୟ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ।

ଏରକମ କି ହୟ କଥନୋ ତୋମାର? ଆମାର ପ୍ରଚୁର
ହତୋ। ଥାମ ଥେକେ ଗିଯେଛିଲାମ ଶହରେର ସ୍କୁଲେ
ପଡ଼ିତେ। ଆମାର ମୁଖ ଦିଯେ କିଛି ବେର ହଲେଇ ଓରା
ବୋଧହୟ ଆମାକେ ଗେଯୋ ଭୃତ, କ୍ଷ୍ୟାତ ବଲେ ପଂଚାବେ
ଏହି ଭୟେ ସିଟିଯେ ଥାକତାମ ସବ ସମୟ।

ଆବାର ଧରୋ କୋନୋ ଦାଓୟାତ ଥେତେ ଗେଛ,
କୋନୋ ରେସ୍ଟୁରେନ୍ ଏ ଗେଛ, କୋନୋ ଆଞ୍ଚିଯେର
ବାସାୟ ଗେଛ—ତୁମି କି ସବ ସମୟ ଭୟେ, ଅସ୍ଵନ୍ତିତେ
ଥାକୋ—ଆମାକେ ଯେ କେମନ ଦେଖାଚେ, ଆମି ଏତ
ଶୁକନା, ଏତ ମୋଟା। ଏହି ବୁଝି ଏମନ କିଛି କରେ ବା
ବଲେ ଫେଲିଲାମ, ଯାତେ ମାନୁଷ ଭାବେ ଆମି ଏକଟା
ନିରୋଟ ବୋକା। ଆମାକେ ନିଯେ ହାସାହାସି କରବେ।

କଥା ବଲାର ସମୟ ନିଜେଇ ନିଜେର
କର୍ତ୍ତା ଶୁଣେ ଭୟ ପାଓ? ଅପରିଚିତ
ମନେ ହୟ? ସବ ସମୟ ନିଜେକେ
ପ୍ରତିଯେ ରାଖୋ? ନତୁନ ବନ୍ଧୁ ବାନାତେ
ପାରୋ ନା? କାରଓ ସାଥେ ତେମନ
ମିଶିତେ ପାରୋ ନା? ଦୋକାନେ ଗିଯେ
ଭିଡ଼ ଠେଲେ କୋନୋ କିଛି କିନତେ
ଗେଲେ ଭୟ ଲାଗେ? ଏମନଟା କି ମନେ
ହୟ ତୋମାର?

ଯଦି ଏମନ ମନେ ହୟ, ତାହଲେ ତୁମି ପ୍ରତି ୨୦ ଜନ
କିଶୋର-କିଶୋରୀଦେର ଏକଜନ, ଯାରା ସୋଶ୍ୟାଲ
ଏଙ୍ଜିଟିତେ ଭୋଗେ। ଭାଲୋ ବାଂଲା ଆସଲେ
ପେଲାମ ନା। ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ, ଲଜ୍ଜା,[୧] ଭିତ୍ତି,
କେ କୀ ମନେ କରେ ଇତ୍ୟାଦି ସବ କିଛିର ସଂମିଶ୍ରଣ
ଆରକି। ଏବଂ ଚୁପି ଚୁପି ବଲି, ଏହି ସବକଟି ସମସ୍ୟା
ଆମାରଓ ଛିଲ! ତୋମାଦେର ଅନେକେର ଚାଇତେ

[୧] ଲଜ୍ଜା କିନ୍ତୁ ଖାରାପ ଜିନିସ ନା। ଲଜ୍ଜା ଦ୍ୱାରାରେ ଅନ୍ଧ
ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗେର ମାନୁମେର ସାଥେ କଥା ବଲାର କେତେ ତୋମାର ଯେ
ଲଜ୍ଜାବେଥେ କାଜ କରେ ଏଟା ତୋମାର ବିଶ୍ୱଦ ଅନ୍ତରେର ଲକ୍ଷଣ।
ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଯାବେ ନା।

অনেক বেশি। সবাই ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে, আমার সবকিছু খুঁটিনাটি দেখে আমার সম্পর্কে নেতৃবাচক মন্তব্য করবে, বা মনে মনে ভাববে এ ধরনের চিন্তাভাবনা কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে আসলে খুবই কমন। নার্ভস হয়ে যাওয়া, ভয় পাওয়া, আতঙ্কিত হওয়া, টেনশন করা, লজ্জা পাওয়া, অস্বস্তি বোধ করা, অনিয়াপদ বোধ করা (ভেতরে একটা কান্থা পাবার অনুভূতির মতো অনেকটা)। এ সময় বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ে)—এগুলো প্রায় সব টিনেজারদের অনুভূতি। তুমি একা নও।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমার এমন অনুভূতি হতো, তা এখনো মনে আছে। বিশেষজ্ঞদের বইপত্র ঘাঁটার পর এরকম একটা লিস্টও পেয়ে গেলাম। তো আসো, আগে সেই লিস্টটা দেখে নাও। যেসব পরেন্ট তোমার সাথে মিলে যায়, সেগুলো টিক দিয়ে রাখো।

- ⇒ ফোনে কথা বলা
- ⇒ ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া
- ⇒ ক্লাসে শিক্ষককে কোনো প্রশ্ন করা, সাহায্য চাওয়া
- ⇒ সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা
- ⇒ দাওয়াত খেতে যাওয়া
- ⇒ স্কুল বা কলেজের খেলাধুলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- ⇒ অন্যদের সামনে কথা বলার সময় কাঁপা-কাঁপি, চেহারা লাল হয়ে যাওয়া, তলপেটে গুলুমুলু গুলুমুলু অনুভূতি হওয়া
- ⇒ অন্যদের সামনে খাওয়া
- ⇒ এমন কোনো ক্রমে প্রবেশ করা যেখানে অন্যরা আছে [স্বল্প পরিচিত বা এই টাইপের মানুষজন]
- ⇒ ক্লাসে জোরে জোরে রিডিং পড়া
- ⇒ ক্লাসে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা
- ⇒ ক্লাসের বোর্ডে কোনো কিছু লেখা



- ⇒ অপরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা
- ⇒ অপরিচিত/পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথোপকথন শুরু বা যোগদান করা
- ⇒ অন্যদের সামনে টয়লেটে যেতে লজ্জা পাওয়া

এই লিস্টের অনেককিছুই হয়তো তোমার মধ্যে আছে। তার মানে কি তোমার সমস্যা আছে? তুমি অসুস্থ?

মোটেই না। আগেই তো বললাম এই বয়সে সবারই কমবেশি এমন অনুভূতি থাকে। এমনকি অনেক ধারড়া মানুষেরও এসব সমস্যা থাকে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ বিষয়গুলো চলে যায়। এই অনুভূতিগুলো নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যদি তুমি এই অনুভূতিগুলোর কাছে পরাজিত হয়ে সেই কাজগুলো না করো বা বড় হবার অপেক্ষায় থাকো—বড় হলে তো সব ঠিক হয়েই যাবে—তাহলেই শুরু হবে সমস্যা! জীবনের অনেক অনেক কিছু মিস করে ফেলবে তুমি। হয়তো পৃথিবীর বুকে সত্য ও ইনসাফের একশটা ফুল ফোটানোর সুযোগ ছিল তোমার। কিন্তু তুমি ফোটাবে একটা। যাদের এই অনুভূতিগুলো হয় তারা ইতোমধ্যেই হয়তো বুবে ফেলেছে, কত কী হারাচ্ছ তুমি, তাই না?^[২]

এই সিরিজে এই বিষয়গুলো থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, তা নিয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। লেখার মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাড়ির কাজ দেওয়া হবে তোমাকে। তুমি যদি এগুলো করো, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই প্যারাগুলো থেকে মুক্তি পাবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)

[২] কথা বলতে লজ্জা লাগে, তাই গার্লফ্রেন্ডকে প্রপোজ করতে পারিনি—এটা আবার ভেবে বসো না। একটা প্রেমই তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। বিস্তারিত পড়তে পারো ‘আকাশের ওপারে আকাশ’ বইতে।



କୁଣ୍ଡଳ

ଲମ୍ବେ ଛାଡ଼ିମିଟି

৩৫ ক্রবার বিকালের দিকে খুব জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল। মাগরিবের সালাতের আগে আগে। হস্তদন্ত হয়ে বের হলাম বাসা থেকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম ব্যস্ত ফুটপাত ধরে। ফুটপাতের পাশের ফাস্টফুডের দোকানগুলোও ছমড়ি খেয়ে পড়েছে ফুটপাতের অর্ধেকটা জুড়ে। হ্যাঁ খেয়াল করলাম, এমনই এক দখলদার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাসার ছেট ভাই সোহাগ। পাঞ্জাবি পরে সেই মাঞ্জা টাঙ্গা মেরে আছে। অথচ দুপুরে সালাত পড়তে গিয়েছিল ফুটপাতের একশ টাকার টিশার্ট আর লুঙ্গি পরে। ও আমাকে অনেক আগেই দেখেছে। এবং দেখেই দোকানের মধ্যে ঢুকে যেতে চাচ্ছিল। ব্যাপার কী? এমন রহস্যময় আচরণ কেন?

ধরলাম ওকে চেপে। কী মিয়া, এখানে কী? মাঞ্জা মেরে কই যাও?

আমি ওকে এভাবে দেখে ফেলব ভাবেনি সে। ভ্যাবাচ্যাক। খেয়ে কিছুক্ষণ তোতলামি করল। এরপর মিনিমিন করে বলল, ‘না, ভাই। এই যে মাগরিবের নামাজ পড়তে যাব।’

যা বোঝার বুঝে ফেললাম আমি। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে আবার হাঁটা ধরলাম, ‘রাতে কথা হবে, ভাইয়া!'

রাতে বাসায় ফিরে দেখি সোহাগ এখনো বাসায় আসেনি। পাশের রুমে গেলাম আড়তা দিতে। সেই হাসাহাসি করছে ঐ রুমের ওরা।

- কাহিনি কী? এত হাসির কী হয়েছে, আমাকেও একটু বলো। আমি ও হাসি!

ওরা কাহিনি বলা শুরু করল। সোহাগের রুমনেট দুইজন এঞ্জেল সাদিয়া টাইপের একটা ফেইক আইডি খুলেছিল মাস হয়েক আগে। অনলাইন থেকে পাওয়া এক মেয়ের ছবি ক্রমাগত আপলোডের মাধ্যমে ফেইক আইডিকে একেবারে বিশ্বাসযোগ্য রক্ত মাংসের মানুষের আইডি বানিয়ে ফেলে। এরপর সোহাগের একটা পোস্টে লাইক দেয়। হরমোনের লাভায় টগবগ করে ফোটা সোহাগ তৎক্ষণাত সেই আইডিতে ফেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। এরপর যা ভাবছ তাই। টেম্পু চালানো শুরু। এই ছয় মাস সোহাগের কাছ থেকে হাজার দুয়েক টাকার

মতো নিয়েছে ওরা বিকাশে। গিফট কেনার জন্য। সোহাগ বহু আবদার করেছে ফোনে কথা বলার। ভিডিও কলে আসার অনুরোধ করেছে। দেখা করার কথা তো বলত দিনের মধ্যে কয়েকবার করে। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। ছয়মাস খেলার পর ওদের মনে হলো, যাক যথেষ্ট খেলা হলো, এবার ফাইনাল একটা মজা নিয়ে খেলা শেষ করা যাক।

আজকে দুপুরে সালাতের কিছু পর সোহাগকে ওরা বলে, ‘বাবু, অমুক এলাকায় আসো। আজকে তোমার সাথে দেখা করব।’

**সোহাগ সেজেগুজে মাঞ্জা মেরে
বের হয়ে যায় ঝড়ের গতিতে। ওরা
সোহাগকে প্রথমে একটা জায়গায়
আসতে বলে, এরপর সেখানে গেলে
বলে অন্য এক জায়গায় আসতে।**

**এভাবে পুরো শহরের অর্ধেক
ঘূরানোর পর সোহাগকে ব্লক করে
ফেইক আইডিটা বন্ধ করে দেয় ওরা।**

গভীর রাতে সোহাগ বাসায় ফিরে। ক্লান্ত, হতাশ, বিদ্যুত্ত হয়ে। ওর সাথে প্রথমে বেশ মজা নেয় বাসার সবাই। এরপর সত্যটা জানায় ওকে। বেচারার মুখের অবশ্য দেখে বেশ খারাপই লেগেছিল।

অল্পের ওপর দিয়ে সোহাগ পার পেয়ে গেলেও সবার কপালে এমন হয় না। অনলাইনের প্রেমে মারাত্মকভাবে ধরা খেয়ে চৰম মাণ্ডল গুনতে হয় অনেকের। কত মানুষ যে মাইনকা চিপায় পড়ে তার ইয়েতা নেই। টাকাপয়সা, ধন-সম্পদ, মান-সম্মানের পাশাপাশি জীবনটা পর্যন্ত হারায়। সেই সাথে আরও অনেক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে, যা একটা পরিবারকে পর্যন্ত শেষ করে দেয়।^[১] কাজেই সাধু সাবধান।

তোমাদের এখন জীবন গড়ার সময় ভাইয়া, আপু। এ সময় তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে এ জীবন ও ওপারের জীবনটা নষ্ট কোরো না। বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ো না।

ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।

[১] বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারো ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত আমাদের ‘আকাশের ওপারে আকাশ’ বইটি।

ପାରିଣାମ

ନାଇକ୍ଷୁଳ ହମାନ ତାଙ୍ଗୀଜ



শাওন বলল, আজ রাতের ভেতরে যে করেই হোক পালাতে হবে। তাই যা নেওয়ার গোপনে গোপনে সবকিছু যেন গোছগাছ করে নেয়। জেরিন আগেভাগেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে যা যা নেওয়ার ব্যাগে ভরে রেখেছে।

রাত তখন একটা কি দেড়টা হবে। পুরো শহর নীরব, নিস্তর। মা ও ছোট বোনটা ঘুমিয়ে আছে। জানালা দিয়ে চাঁদের এক টুকরো আলো পড়েছে ছোট বোনটির মুখের ওপর। কি ভীষণ মায়াবী দেখাচ্ছে আজ তাকে! জেরিন চোখ বন্ধ করে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল কুম থেকে। একটিবারের জন্যেও ওর পাণাগ হাদয়টা কেঁপে উঠল না মা আর ছোট বোনটির চেহারা মনে করে!

শাওন সিএনজি নিয়ে জেরিনদের বাসার সামনেই অপেক্ষা করছিল। জেরিন আসামাত্রই দ্রুত সিএনজি স্টার্ট দিল ড্রাইভার। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা পর ওরা পৌঁছে গেল অন্য শহরে। সেখানে আগে থেকেই সবকিছু ঠিক করে রেখেছিল শাওন।

এক দেড় মাস বেশ শাস্তিতেই কাটল ওদের সংসার। দুজনের মাঝে আদান-প্রদান হলো সম্পত্তি সবটুকু ভালোবাসা। কিন্তু এই ভালোবাসা আর স্থায়ী রইল না। দেড় মাস পর শাওনের জমানো সব টাকা ফুরিয়ে গেল। দু' মুঠো ভাত খেতেই তখন ওদের হিমশিম অবস্থা। তার ওপর জেরিন শুনল, ও নাকি নিয়মিত জ্বর খেলে। ভালোবাসা রূপ নিল ঘৃণায়। ক্রমেই দুজনের মধ্যে ঘটতে থাকল সম্পর্কের অবনতি। শাওন দুর্ঘবহার করতে থাকে জেরিনের সাথে। এমনকি গায়ে হাতও তুলে একপর্যায়ে। দিনদিন মারপিট যেন বেড়েই চলে।

জেরিনের চোখ খুলে যায়, ঘটে যাওয়া এই অন্যায় আর অপূরণীয় এই ক্ষতির কথা ভেবে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার কারণে ও না পারে মাকে মুখ দেখাতে, আর না পারে অন্য কোনো আত্মীয়ের

কাছে একটুখানি ঠাঁই নিতে। সবকিছু সয়ে তাই শাওনের কাছেই থেকে যায় ও।

কিন্তু একদিন হঠাত করেই বাসা থেকে উধাও হয়ে যায় শাওন। একদিন দুদিন করে করে কেটে যায় চার চারটি মাস। শাওন আর ফিরে আসে না।

জেরিনের জীবনে অঙ্ককার নেমে আসে। তুমুল গাঢ় সে অঙ্ককার। জেরিন সে অঙ্ককারে পথ খোঁজে পায় না। এদিক-ওদিক কোনোদিকেই সন্ধান পায় না এক টুকরো আলোর। উদ্রাঙ্গ পথিকের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে এদিক-ওদিক। হোঁচ্ট খায় পথের এখানে-সেখানে।

জেরিন সেই পড়ে যাওয়া থেকে আর উঠতে পারে না। জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠে তার জন্য।

একদিন কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সে। বাসা ছেড়ে একাকী বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। তারপর আর কোনো খোঁজ নেই।

পুনশ্চ :

সেদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় থেঁতলে যাওয়া একটা ছবিসহ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছিল এমন—

‘টেনচাপায় এক তরুণীর আত্মহত্যা।’





ରାତ୍ଲାର ସିଂହପୁନ୍ତମ ହାଜି ଶରୀୟତ ଉଦ୍ଘାତ

(୧୯୮୫)

ଶାହରିଆର ହୋସାଇନ

କରଜ! ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣଲେଇ ଆମାଦେର ଏମନ କିଛୁ ବିଧିବିଧାନ ମାଥାଯ ଆସେ, ଯା ଅବଶ୍ୟାଇ ପାଳନ କରତେ ହବେ । ଅର୍ଥାଏ ଅବଶ୍ୟପାଳନିୟ ବିଧାନସମ୍ମହା ଆମରା ଆଜକେ ଏମନ ଏକଟି ବିନ୍ଦୁବ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନବ, ଯାର ନାମଇ ଛିଲ ଫରାୟେଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଫରାୟେଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଲୋ ଏକଟି ଧର୍ମୀୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯା ଉନିଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମ ଦିକେ ସୃଚିତ ହେଁଛି । ଫରାୟେଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନେର ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର ଛିଲେନ ବିଖ୍ୟାତ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହାଜି ଶରୀୟତଉଦ୍ଘାତ ରହିମାଉଦ୍ଘାତ । ଆଜ ଆମରା ଜାନବ ଫରାୟେଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନେର ନେତା ହାଜି ଶରୀୟତଉଦ୍ଘାତ ସମ୍ପର୍କେ ।

ହାଜି ଶରୀୟତଉଦ୍ଘାତ ରହିମାଉଦ୍ଘାତର ଜନ୍ମ ୧୯୮୧ ମାର୍ଚ୍ଚି ତଙ୍କାଲୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଟର୍ ଇନ୍ଡିଆ କୋମ୍ପାନିର ଶାସନାଧୀନ ବେନ୍ଦଳ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଫରିଦପୁର ଜେଲାର ଚର ଶାମାଇଲ ଗ୍ରାମେ ଏକ ତାଲୁକଦାର ପରିବାରେ ।

ହେଲେବେଳୋଯ ତିନି ବାଡ଼ି ଥେକେ ପାଲିଯେ ଚଲେ ଆସେନ କଳକାତାଯ । ହଜେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଁର ଗୁରୁ ମାଓଲାନା ବାଶାରତ ଆଲୀର ସାଥେ ୧୯୯୯ ଖିଟାକ୍ରେ ମକ୍କା ଗମନ କରେନ । ୧୯୧୮ ଖିଟାକ୍ରେ ସେଖାନ ଥେକେ ଦେଶେ ଫିରେ ଆସେନ । ଆରବି ଭାଷାଯ ପଣ୍ଡିତ ଛିଲେନ ତିନି ।

ମକ୍କା ଥାକାକାଲୀନ ହାଜି
ଶରୀୟତଉଦ୍ଘାତ ସଂକଲ୍ପବନ୍ଧ ହନ
ଯେ, ଦେଶେ ଫିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରେ
ମନୋଯୋଗୀ ହବେନ । ତାଇ ମକ୍କା ଥେକେ
ଫିରେଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାରେ ମନୋନିବେଶ
କରେନ । ଉନିଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମ
ଦିକେ ଏ ଅଞ୍ଚଳେ ତାଁର ନେତୃତ୍ବେ ଯେ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଡ଼େ ଉଠେ, ସେଟାଇ
‘ଫରାୟେଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ’ ନାମେ
ପରିଚିତ ।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে হাজী শরীয়তউল্লাহ যে ফরজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) রূপক বা খুঁটি। এগুলো হচ্ছে: ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতে বিশ্বাস, সালাত, সাওম, হজ ও যাকাত। ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন সব বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে দ্বীন ইসলামে যা কিছু অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানান।

হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। তিনি বিধী ইংরেজ শাসনকে ঘৃণা করতেন। তিনি ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ বলে ঘোষণা করেন। ‘দারুল হারব’ মানে হলো কুফরি শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত রাষ্ট্র। অর্থাৎ, যে ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, তা-ই দারুল কুফর তথা দারুল হারব।

যাই হোক, সে সময় মুসলিমদের মাঝে অনেক হিন্দুয়ানি প্রথা ও আচার-আচরণের প্রচলন ঘটেছিল। পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই খালি ঢোকে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে তেমন পার্থক্য করা যেত না। পাশাপাশি ইংরেজ শাসনের বলে মুসলিমদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে জমিদারীর বাধা প্রদান করতে থাকে। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গরু কুরবানি এবং আযান দেওয়া নিষিদ্ধ হলো।

মুসলিমদের ওপর নানা ধরনের কর আরোপ করা হলো। দাঢ়ি রাখলে কর দিতে হতো। হিন্দুদের বিভিন্ন পৃজা-পার্বণ উপলক্ষ্যেও মুসলিম প্রজাদের কর দিতে হতো হিন্দু জমিদারদের। এ ছাড়া ফসলের ওপরেও করের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পাশাপাশি নীলকরেরা হিন্দু-মুসলিমান নির্বিশেষে সকল কৃষকদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার করছিল।

দিন দিন শোষণের মাত্র বেড়েই যাচ্ছিল। যেটা হাজী শরীয়তউল্লাহ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি নির্যাতিত-বধিত সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলেন। অন্যায় কর প্রদান করতে নিষেধ করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শুধু মুসলিমরাই নয়, নিয়ন্ত্রণের শোষিত হিন্দুরাও দলে দলে যোগ দিল ফরায়েজীদের সঙ্গে।

আল্লাহর ইচ্ছায় হাজী শরীয়তউল্লাহর হিমাহল্লাহর প্রচেষ্টায় মুসলিমরা সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআত ও হিন্দুয়ানি প্রথা দূর করে ইসলামের মূলে ফিরে আসে। শোষিত-বধিত ও নিষেধিত জনসাধারণ হাজী শরীয়তউল্লাহর আহ্বানে নতুন প্রাগসংঘরণ অনুভব করল। দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল।

অল্লে সময়ের মধ্যে দশ হাজার মুসলিম তাঁর দলভুক্ত হলো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। এখন মুসলিমদের আর আগের মতো নির্যাতন করা যাবে না। যেসব নিয়ন্ত্রণের দরিদ্র মুসলিমানদেরকে তারা তাদের দাসে পরিণত করেছিল, তারাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তাদের উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠারই কথা।

**কুফরি শক্তি সবসময় ইসলামকে
ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক।**
বাইরে থেকে মনে হতে পারে
কুফর অনেক শক্তিশালী, কিন্তু
এর পরাজয় সুনিশ্চিত। তাদের
অন্তরে সব সময় পরাজয়ের
আতংক লেগেই থাকে। আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তাআলাহু একমাত্র
সাহায্যকারী, যিনি কাফিরদের
অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন আর
মুমিনদের বিজয় দান করেন।

আল্লাহ বলেন,

‘যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সে অবস্থায় এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুনিনদের উচিত আল্লাহর ওপর
ভরসা করা।’^[১]

ফরায়েজীরা ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। এর অংশ হিসেবে তাঁরা ইংরেজদের শোষণের হাতিয়ার আদালত ব্যবকট করেন। পরিবর্তে স্থানীয় আদালত ব্যবস্থা বা পঞ্চয়তে ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই আদালতে স্থানীয়ভাবেই সকল বিচার-সালিস করা হতো। এতিহাসিক জেনস ওয়াইজের মতে, পূর্ব বাংলার পঞ্চয়তেগুলো জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরায়েজীদের নিয়ন্ত্রিত প্রামণ্ডলগুলোতে সংখ্যাটি হিসাব্বাক বা মারামারির কোনো ঘটনা কদাচিং নিয়মিত আদালত পর্যন্ত গড়াত। ফরায়েজী-প্রধান ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন, তাৎক্ষণিকভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করতেন। এমনকি যেকোনো হিন্দু বা খ্রিস্টান তার পাওনা আদায়ের জন্য ফরায়েজী নেতাদের কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারত। এর ফলে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, মানব সমাজকে এগিয়ে নেবার জন্য বস্তগত উন্নয়নের চেয়েও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার বেশি জরুরি। ফরায়েজীরা এ কাজটিই করতে পেরেছিলেন। আগেই বলেছি, জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের সহায়তা লাভের জন্য এ আন্দোলনে যোগ দেন বিপুলসংখ্যক হিন্দু ও দেশীয় খ্রিস্টান। কেননা, শোষণ-নিপীড়ন কেউই সহ্য করতে পারে না। ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা একাত্মতা প্রকাশ করেছিল ফরায়েজীদের সাথে।

[১] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৬০

এভাবেই যখন আন্দোলনের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকল, তখন ইংরেজ, নীলকর আর জমিদারদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তাই ১৮৩৭ সালে তারা শরীয়তউল্লাহ রহিমাতুল্লাহকে তিতুমীরের মতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগের ‘অভিযোগে’ অভিযুক্ত করে। ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় অসংখ্য মামলা। ইউরোপীয় নীলকররা তাদের সহায়তা করে। কিন্তু ফরায়েজীদের প্রচেষ্টাগুলো ছিল সুচিস্তিত। রাষ্ট্র ও প্রচলিত আইনকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছিল না তাদের প্রয়াস। দিনশেষে অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তারপরও হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাতুল্লাহকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় কিছুদিনের জন্য। তাঁর মৃত্যুর জন্য নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিল শোষক শ্রেণির মানুষেরা।

১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মারা যান। কিন্তু থেমে যায়নি এই আন্দোলন। পরবর্তীতে তার ছেলে মুহসিন উদ্দিন দুর্দু মিয়ার হাত ধরে ফরায়েজী আন্দোলন পায় অন্য মাত্রা। আমাদের আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্বকায়তা এবং সত্যিকার ইসলামি জীবনধারার উত্থানের প্রয়াসের পাশাপাশি স্বাধীকারচেতনার নতুন জমি তৈরি হয় দুর্দু মিয়ার হাত ধরে, যার ওপর পা রেখেছে কৃষিপ্রধান বাঙালি মুসলমানের পরবর্তী অগ্রগতি!

পরবর্তী পর্বে আমরা জানব মুহসিন উদ্দিন দুর্দু মিয়া সম্পর্কে এবং কীভাবে এগিয়ে গিয়েছিল সেই ফরায়েজী আন্দোলন! সেই পর্যন্ত উপলব্ধি করতে থাকো মহান এই মানুষটির কাজের গুরুত্ব ও সাধারণ শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে।

[চলবে ইনশা আল্লাহ...]



ফলোয়ার

হিমেল মাহমুদ

ছোটবেলা থেকেই মাসুদের স্বপ্ন, অনেক কিঞ্চিৎ সে এখনো কোনো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। কদিন নিউজফিড স্ক্রল করতে করতে হঠাত তার সামনে ভেসে উঠল পরিচিত এক মুখ। এ তো তার বন্ধু শাহেদ। ভিডিওটিতে শাহেদ বানরের মতো করে তার হাত পা ছুড়ছে আর কোমর দুলাচ্ছে। ব্র্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক বাজছে, ‘পাছ আও না, সাথ রাহো না’।

মাসুদ দেখল ভিডিওটিতে হাজার হাজার লাইক আর কমেন্ট। সে ফ্রেন্ডের প্রোফাইলে ঢুকল। ফলোয়ার 100K!

মাসুদের মাথা ঘুরে গেল। শাহেদ এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে! শাহেদকে নক দিল সে ম্যাসেঞ্জারে।

- বন্ধু, কেমন আছ?

দশ মিনিট পর মেসেজ সীন করল শাহেদ।

- ভালো। তুই?

- এত দেরি করে রিপ্লাই দিলি কেন, শালা!

- রাগ করিস না, বন্ধু। ব্যস্ত ছিলাম। টিকটক করছিলাম। টিকটকে আমি এখন অনেক বড় সেগুরিচি। আমার টিকটকে 1M ফলোয়ার!

- তুই এত জনপ্রিয়! কীভাবে সস্তব! তোর এত ফলোয়ারের রহস্য কী?

- এখন টিকটকে ট্রেন্ড চলছে, শাড়ি বা বোরখা পরে কোমর দুলিয়ে এবং মেয়েদের ভয়েসে লিপসিং করে ভিডিও বানানো।

- তোর লজ্জা করে না এসব করতে?

- লজ্জা করবে কেন? জনপ্রিয় হতে গেলে একটু-আধটু এসব করতেই হয়।

- ওহ, আচ্ছা।

চ্যাম্প মাস পর!



শাহেদদের বাড়ির ছাদে শাড়ি পরে এক যুবতী নাচছে। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে এক যুবক। আরেক যুবক সেটার ভিডিও শুট করছে। কিছুক্ষণ ধরে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এসব বাজে ভিডিও শুট করতে বারণ করার জন্য শাহেদদের ছাদে গেলাম।

ছাদে যাবার পর আমার মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি যাকে যুবতী ভাবছিলাম সে আসলে একজন পুরুষ! আরে এ তো আমাদের প্রিয় মাসুদ।

- মাসুদ, তোমার এই দশা কেন? তোমার শরীর ও পোশাকে এত পরিবর্তন কেন?

- ভাইয়া, আমার নাম আর মাসুদ না। আমার নাম এখন এঞ্জেল মাসুদ। আমার এই নামে একটা টিকটক আইডি আছে। আমার 10M ফলোয়ার। আমার ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার কইরেন, ভাইয়া।

এক বছর পর...

**ব্যস্ত নগরীতে একটা নগুর্ণির
নিচে একদল যুবক বসে আছে।**

ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড
হাতে। তাদেরকে ক্যামেরায় বন্দী
করার জন্য ব্যস্ত কিছু সাংবাদিক
ভাইয়েরা। তাদের একটাই দাবি,

**সমকামিতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে
অনুমোদন দিতে হবে। ভালো করে
লক্ষ করে দেখলাম, যুবকদলের
মধ্যে মাসুদ সরি, এঞ্জেল মাসুদও
রয়েছে।**

ওপরের গল্পটা কাল্পনিক। তবে বাস্তবতা বিবিজ্ঞ নয়। খুব শীঘ্ৰই এমন একটা কিছু বাংলাদেশে হতে চলেছে। লৃত আলাইহিস সালামের জাতির কথা কি ভুলে গেছি আমরা? কী পরিণতি হয়েছিল তাদের?

তুমি কি ভাবছ বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে তো এটাকে বৈধ করা হয়েছে। তাদের ওপর তো গজব আসল না। আল্লাহ ছাড় দিচ্ছেন বলে ভাবছ, ছেড়ে দেবেন। আল্লাহ যখন পাকড়াও করবেন, তখন পালাবার পথ পাবে না। আর গজব কি ইতোমধ্যে আসেনি? ওদের পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ভয়ংকর রোগব্যাধি, খুন, ধৰ্ষণ, হতাশা, আত্মহত্যা, একাকিন্ত ওদের কুরে কুরে খাচ্ছ। বৃন্দ বাবা-মা একাকী ফ্ল্যাটে মরে থাকে, লাশ পাঁচে গলে যায়, তাও কেউ ওদের খোঁজ নিতে আসে না। এগুলো কি আয়াব নয়?

তাই এগুলো প্রমোট করা বন্ধ করো। নিজের অজ্ঞেই তুমি সমকামিতাকে প্রমোট করছ। সতর্ক হও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘আল্লাহ তাআলা সেসব মহিলাদের
ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা
পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে
সকল পুরুষদের ওপর অভিশাপ,
যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।’^[১]

একই হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা
রদিয়াল্লাহ আনহু ও।^[২]

তে ভাই, কেন তুমি এভাবে নিজেকে ছেট
করছ? আল্লাহ তোমাকে পুরুষ বানিয়েছেন।
তোমার আচার-আচরণ হবে পুরুষালী। কেন
তুমি এভাবে নিজেকে অসম্মান করছ?

[১] বুখারি, আস-সহীহ, হাদিস নং : ৪৪২৯

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদিস নং : ৪৪৬৯

দুআ সিরিজ:

বিশ্বের প্রাণীর ক্ষতি থেকে বীচাৰ দুআ



ইনজেকশনে আমাৰ খুব ভয় কৰো। কিন্তু এই কয়দিন আগেই ইনজেকশন দিতে হলো। অসাৰধানে পা দিয়ে বসেছিলাম এক কুকুৱেৰ গায়ে। আৰ যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে দিল কামড়। এৱকম অসাৰধানতাবসত কামড় অনেককেই থেকে দেখেছি। বিড়ালেৰ কামড়, কুকুৱেৰ কামড়, এমনকি সাপেৰ কামড় পৰ্যন্ত।

ইনজেকশন দেবাৰ সময় আমাৰ ভয় পাওয়া দেখে ডাক্তাৰ হো হো কৰে হেসে উঠল।

**‘আৱে, পুৱুষ মানুষ হবে বাঘেৰ
মতো, ভয়ড়ৱহীন। এমন কৰলে হবে! ’
ইনজেকশন দিতে দিতে বললেন উনি।**

হাতে সিটচ বেঁধে নেবাৰ পৱ আমাৰ আতঙ্ক কিছুটা কমল। এতক্ষণ মনে মনে ডাক্তাৱেৰ চৌদগুষ্ঠি উদ্বাৰ কৰছিলাম। এবাৰ একটু ভালো কৰে তাৰ দিকে তাকালাম।

ডাক্তাৱেৰ বয়স একেবাৱেই অল্প। কেবল পাশ কৰে বেৰ হয়েছে মনে হয়। একমাথা চুল, গালে সুন্দৰ দাঢ়ি। নূৰানি চেহাৰা যাকে বলে। হাসি হাসি মুখে আমাৰ দিকে তাকিয়ে আছে। উনাৰ চেহাৰা দেখে আমাৰ রাগ কিছুটা কমল।

- বুবাছ, তুমি যদি একটা দুআ জানতে, তাহলে কিন্তু আৰ এই ইনজেকশন দেওয়া লাগত না?

- দুআ!

- হ্যাঁ, দুআ!



أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(উচ্চারণ : আউয়ু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক)

এৰ অৰ্থ হলো, আমি আল্লাহৰ পৱিপূৰ্ণ কালিমাৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্ৰাণী এবং প্ৰত্যেক কুদৃষ্টিৰ অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি।

- এই দুআ পড়লেই হবে?

- হাদিসে তো এমনই এসেছে। আবু হৱায়ার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বৰ্ণিত হাদিসে আল্লাহৰ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ তিনবাৰ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত প্ৰাণী, বিশেষ কৰে সাপ, বিচু প্ৰভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্ৰাণীৰ অনিষ্ট থেকে রক্ষা কৰবেন।’^[১]

তাৰ মানে আৰাৰ এমন না যে, তুমি গোখৰা সাপেৰ সামনে গিয়ে হাত বাঢ়িয়ে দিয়ে বলবে— সাহস থাকলে কামড় মাৰ!

চেম্বাৰে অন্য রোগী ঢুকছে। বেৰ হবাৰ আগে পিঠে একটা স্নেহেৰ চাপড় অনুভব কৰলাম। ডাক্তাৰ ভাইয়া হাসিমুখে বিদায় জনালেন আমাকে।

ভালো থেকো, চ্যাম্প! হাসপাতালে আৰ যেন দেখা না হয়!

[১] তিৰমিয়ি, আস-সুনান, হাদিস নং : ৩৬০৪



টয়লেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু! তোমার পকেটে!

লক্ষ মার্জিনি

হ্যাঁ, ভাইয়া ও আপু! শিরোনাম ঠিকই পড়েছা। টয়লেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু তুমি পকেটে নিয়ে ঘুরো। বিছানায়, খাবার টেবিলে, পড়ার টেবিলে, টয়লেটে, ক্লাসরুমে, খেলার মাঠে, মাসজিদে—দুনিয়ার এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তুমি সেটা নিয়ে যাও না। দিনের প্রায় ২৪ ঘণ্টাই তুমি তাকে নিয়ে থাকো। তার সাথে তোমার অবিচ্ছেদ্য বস্তু। তাকে না দেখলে তুমি থাকতে পারো না। সেটা কী জিনিস, বলো তো! ধরে ফেলেছ, তাই না?

সেটা হলো মোবাইল ফোন। তোমার জীবনের অপরিহার্য মোবাইল ফোন এতটাই নোংরা। এটা আমার কথা না। আমেরিকার অ্যারিয়োনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের কথা। ইউনিভার্সিটি অফ টার্টুর আরেকদল গবেষক জানাচ্ছেন,

হাই-স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফোনে প্রায় ১৭ হাজার ব্যাকটেরিয়ার জিন প্রতিলিপি তৈরি করে সংখ্যায় বেড়েছে।

আসলে এই যে আমরা টয়লেট থেকে শুরু করে রান্নাঘর, লোকাল বাস, ক্লাসরুম, মাঠে-ময়দানে সব জায়গায় নিয়ে যাই, সেখান থেকে জীবাণু চলে আসে আমাদের ফোনে। ফোনের উষ্ণ আবহাওয়া জীবাণুদের জন্য পোয়াবারো হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমানে বংশবিস্তার করে তারা। তো এরপর তারা ফোন থেকে পার হয় আমাদের আঙ্গুলে, হাতে। সেখান থেকে মুখে, নাকের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে। ব্রিটিশ কলান্ধ্বয়া সেটার ফর ডিজিস কন্ট্রোল তো বলেছে—মোট ইনফেকশনের শতকরা ৮০ ভাগই ছড়ায় হাতের মাধ্যমে।^[১]

[১] How Dirty Is Your Cell Phone? saniprofessional.com- <https://tinyurl.com/32c2udfr>

বুঝতেই পারছ, রোগজীবাগুর এই আতুড়ঘর ফোনকে পরিষ্কার রাখতে হবে নিয়মিতই। না হলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙেচুরে দিতে পারে। যেমন ধরো, মোবাইল ফোনের ক্রিনে থাকা E.coli ব্যাকটেরিয়া জ্বর, বনি, ডায়ারিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে। MRSA হাড়, ফুসফুস, হাদপিন্ডের ভাল্ল ইত্যাদিতে প্রাণঘাতী ইনফেকশন তৈরি করে। তা ছাড়া তোমার শরীরকে বহুল ব্যবহাত কিছু এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ অসুখ হলে নিরাময়ের জন্য তোমার শরীরে সেই এন্টিবায়োটিক ওষুধগুলো আর কাজ করবে না। ওইদিকে ক্রিনে থাকা মোল্ড ফাংগাসের কারণে এলার্জিজনিত অসুখ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- সর্দি কাশি, গলা, নাক চুলকানো, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যাথা, ক্লান্তিভাব ইত্যাদি।^[২] এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে মোবাইল ফোন পরিষ্কার করতে হবে?

যা যা লাগবেং :

দুটো নরম মস্ণ কাপড়, ক্ষারমুক্ত সাবান, টুথপিক বা কটনবাড় ও পানি।



যেভাবে পরিষ্কার করবে :

প্রথমে জানতে হবে তোমার ফোন কতটা পানিনিরোধক। সেটা বুঝে ঠিক করো ফোন পরিষ্কারের জন্য কতটা পানি ব্যবহার করা নিরাপদ হবে। সরাসরি পানি ব্যবহার না করে সতর্ক থাকার জন্য ভেজা টাওয়েল ব্যবহার করতে পারো।

১. ফোনের সঙ্গে কোনো কেবল লাগানো থাকলে সেটা খুলে ফোন বন্ধ করো। খেয়াল রাখবে, ফোনের ও তোমার, কারও যেন

[২] Signs and Symptoms of Cell Phone Addiction, psychguides.com- <https://tinyurl.com/ypzye3ca>

[৩] মোবাইল ফোন জীবাণুমুক্ত করবেন যেভাবে, যুগান্ত, ১৪ মার্চ ২০২০-<https://tinyurl.com/phonesclean>

ক্ষতি না হয়।

২. হালকা ক্ষারমুক্ত সাবানের সঙ্গে পানি মিশিয়ে নিজের বিবেচনায় সাবান-পানির অনুপাত ঠিক করো।
৩. এক টুকরো নরম মস্ণ কাপড় সাবান-পানির মিশ্রণে ভিজিয়ে নাও। এরপর কাপড় থেকে অতিরিক্ত পানি ভালোভাবে ঝরিয়ে নাও।
৪. পানি ঝরানো ভেজা কাপড় দিয়ে ফোনের ওপর, নিচ ও পাশের অংশ মুছো।
৫. ফোন যতই পানিনিরোধক হোক না কেন, সরাসরি সাবান-পানির মিশ্রণে ডুবাবে না।
৬. এবার এক টুকরো শুকনো নরম মস্ণ কাপড় দিয়ে ফোন মুছে নাও।
৭. সিমহোল্ডার থেকে সিম খুলে নাও। সেটিও চাইলে পরিষ্কার করতে পারো। তবে করতেই হবে এমন নয়।
৮. সাবান-পানির মিশ্রণে কটনবাড় ডুবিয়ে নাও। আঙুল দিয়ে চেপে অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নাও।
৯. সিমকার্ড ঢোকানোর ট্রে ও স্থানটি ভেজা কটনবাড় দিয়ে সাবধানে পরিষ্কার করো। প্রয়োজনে টুথপিক দিয়ে সিমকার্ড ঢোকানোর স্থানের ময়লা বের করতে পারো।
১০. শুকনো কাপড় দিয়ে সিমকার্ড ঢোকানোর ট্রে মুছো।
১১. এরপর সব আবার জায়গা মতো সেট করে ফোন চালু করো।

প্রতিরোধমূলক কিছু ব্যবস্থা :

এই জায়গাগুলোতে ফোন নিয়ে যাব না—

- ট্যালেট
- রান্নাঘর
- ডাইনিং টেবিল
- এমন কোনো স্থান যেখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, জীবাণু বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে

পারে

- হাসপাতাল, চিকিৎসকদের চেম্বারে একান্ত
প্রয়োজন ছাড়া ফোন ব্যবহার করব না

মাঝে মাঝেই ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত
ধোব। বিশেষ করে-

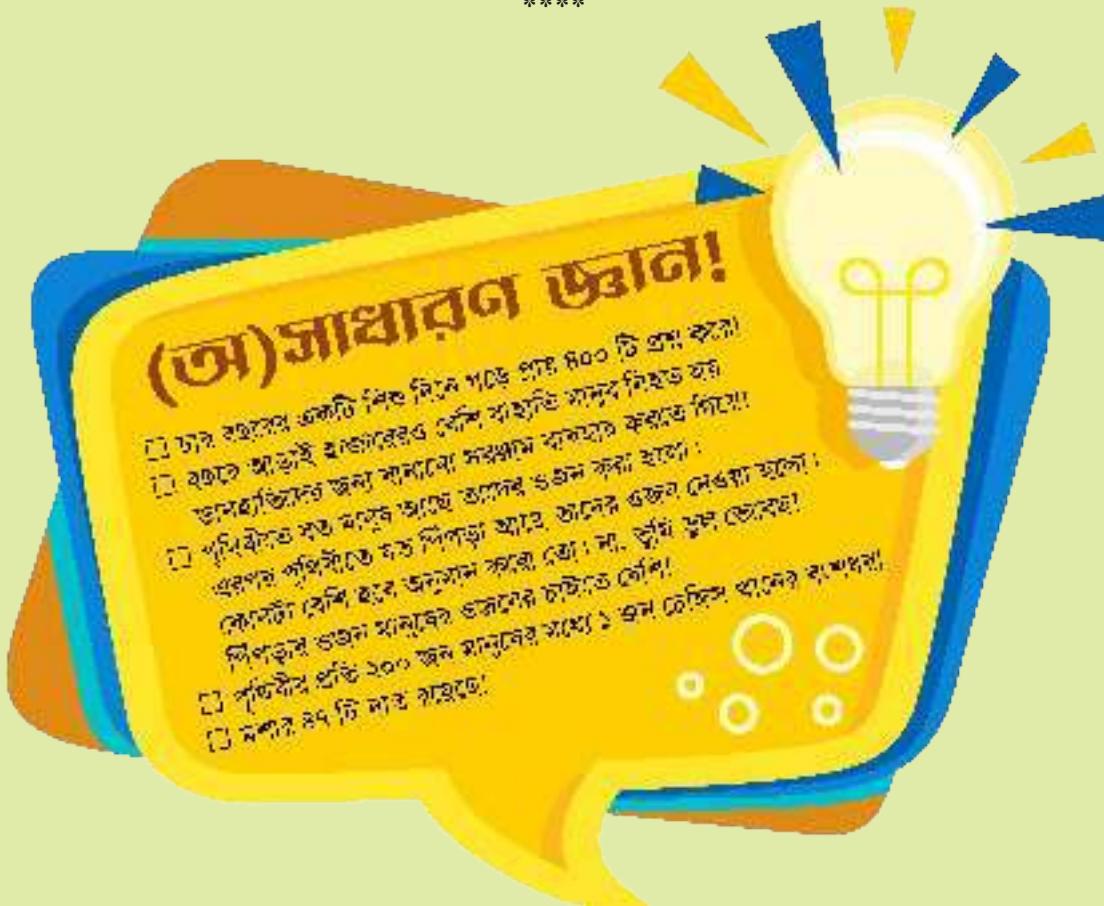
- রান্না করার সময়, পূর্বে এবং পরে
- খাবার পূর্বে ও পরে
- ট্যালেট ব্যবহারের পরে
- হাঁচি কাশি বা নাক পরিষ্কার করার পরে
- শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের পর

কে কোনো প্রাণীকে স্পর্শ করার পর

কে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার পর

কে ডাস্টবিন স্পর্শ করার পর

তবে সবচেয়ে ভালো হলো, সারাদিন ফোনের
ক্রিনে ঘাড় গুজে না থেকে, বাস্তব দুনিয়ার
জীবনটা উপভোগ করো। কত কী করার আছে।
কত কিছু শেখার আছে। স্মার্টফোন আসক্তি
তোমার জীবন খেয়ে ফেলছে। অজগর সাপের
মতো গিলে ফেলছে তোমাকে। একটু একটু
করে।



মাটির মাসজিদ

আল-মুহার আল-মুবাৰকুল



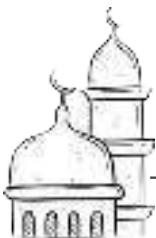
আমাদের দেশের মাসজিদগুলোর পেছনে লাখ লাখ কিংবা কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। শ্বেত পাথর, ঝাড়বাতি, টাইলস, দামি কার্পেট... সব মিলিয়ে যেন রূপকথার রাজপ্রাসাদ। মাসজিদ এত সুসজ্জিত করা ইসলামের মেজাজের সাথে যায় না। রাসূলমুহাম্মদ এর মাসজিদ ছিল মাটির তৈরি। মাটি আর খেজুর পাতার চাটাই-এর এই ছোট মাসজিদ থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। চলো, দেখে আসি মাটির তৈরি কয়েকটি চৰৎকার প্রাচীন মাসজিদ।



আল-মুহার মাসজিদ, ইয়েমেন। এটি নির্মিত হয়েছিল ১৫তম শতাব্দীতে।



চেনিনি মাসজিদ, দক্ষিণ তিউনিসিয়ার "Mosque of Seven Sleepers" বা ৭ জন ঘুমন্ত ব্যক্তির মাসজিদ। মাসজিদের আশেপাশে কিছু অস্থাভাবিক বড় সমাধি (প্রায় ৪ মিটার দীর্ঘ) রয়েছে।





আল বিদিয়া, আৱৰ আমিৱাত
নিৰ্মাণের কয়েক শতাব্দী পৱেও সেই প্ৰথম দিনেৱ
মতো সালাতেৱ জামাআত আদায় হয় এখানে।



লাৱাৰঙ্গা মাসজিদ, ঘানা
এটা ঘানাৰ সবচেয়ে পুৱাতন মাসজিদ এবং পশ্চিম
আফ্ৰিকাৰ পুৱাতন মাসজিদগুলোৰ মধ্যে অন্যতম।
১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে মাসজিদটি তৈৰি হয়।



ডিঞ্জুৱেৰাৰ মাসজিদ, মালি
১৩২৫ এবং ১৩২৭ সালেৱ মধ্যে নিৰ্মিত
হয়েছিল।



ফকুৰ আদ-দ্বীন মাসজিদ, সোমালিয়া
সোমালিয়াৰ দ্বিতীয় প্রাচীনতম মাসজিদ। এটি
আফ্ৰিকাৰ সপ্তম প্রাচীনতম মাসজিদ বলে মনে
কৰা হয়।



কং মাসজিদ, আইভোৱি কোস্ট
১৭ শতকে নিৰ্মিত। এখনো এখানে জামাআত
অনুষ্ঠিত হয়।



নান্দো মাসজিদ, মালি
১২ শতকে নিৰ্মিত।



আতিক মাসজিদ, লিবিয়া
দাদশ শতাব্দীর মাসজিদ, এই অঞ্চলের
প্রাচীনতম।



সরোবাঙ্গ মাসজিদ, আইভেরি কোস্ট
১৭ বা ১৮ শতকে নির্মিত। ২০২১ সালে
ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়।



উপর্যুক্ত



মাসজিদের হাসান
মদরাসা দারুল রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা

মা এবাদা বাসে,
নক্ষা হেসে!
একটা সময় হেসে ছিলে
এখন হয়েছে বড়,
সব হেসে মন পড়ছে বসাও
নিজের ঝীরন গড়ে।

হেসে
বগে অবালে,
শোনা ভবে—
ভাসে লাগে না পড়ার টেবিল
মন থাকে তই মাঠ,
বাকুল এ-মন চৰ সারাকে
কঢ়িক সময় থাক্কে।

মা সবিশেষ
দের উপরেশ—
জীবন তোমার লোভের তরী
চাইবে কলেক বিষু
চলতে হবে একটা লক্ষণ্যতা
হেডে এ-ধৰণ পিষু।

ভানতে হবে আজ্ঞাহ-রাসূল
পড়তে হবে সুবাহান,
তুরই জীবন সার্খক হবে
ওপার পানে পরিহান।



বড়শি

সাওদা সিদ্ধিকা নূর

১.

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা হবে হবে ভাব।
হোস্টেলের ছাঁদে বসে সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষায়
সিফাত। যদিও ঢাকা শহরের দানবাকৃতির
এই বিল্ডিংগুলোর ফাঁকে সূর্যাস্ত দেখা যায়
না। তারপরও অবাক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে
তাকিয়ে আছে সে। সন্ধ্যার স্নিখ লালিমাটুকু
বিল্ডিংয়ের মাথার ওপর এলোমেলো ছাতার
ন্যায় জেঁকে বসেছে। কংক্রিটের এই প্রাণহীন
শহরে সৌন্দর্য বলতে বুঝি এটুকুই অবশিষ্ট
রয়েছে।

তিন মাস হলো সিফাত হোস্টেলে উঠেছে।
এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেই ঢাকা চলে এসেছে।
ভালো একটা কলেজে ভর্তি হবার এক বুক স্বপ্ন
নিয়ে হোস্টেলে উঠেছে। ফার্মগেইটের স্বনামধন্য
একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সদ্য
গ্রাম থেকে আসা বালক শহরে পরিবেশের সাথে
ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেনা। এখানকার তুখোড়
ছাত্রদের কাছে নিজেকে নাদান মনে হচ্ছে তার।
হতাশার চোরাবালি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে
তাকে। আশার আলো বলতে শেট্টুকু আছে, তা
হচ্ছে আগামীকালের রেজাল্ট। ভালো রেজাল্ট
না আসলে বাবার কাছে মুখ দেখানোর আর
কোনো উপায় থাকবে না।

সন্ধ্যার স্নিখ লালিমাটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে
যাচ্ছে দানবাকৃতির বিল্ডিংগুলোর পেছনে।
একদল কাক কা কা করে উড়ে যাচ্ছে। মনে
হচ্ছে এই শহরে তারা আর কথনো ফিরবে
না। সিফাতেরও নিজেকে মাঝে মাঝে এই
কাকগুলোর মতো মনে হয়। যদি রেজাল্ট খারাপ
হয়, তবে সিফাতও এই কাকগুলোর মতো শহর
ছেড়ে চলে যাবে। আর ফিরবে না।

সিফাত যে বাজে ছাত্র, তা কিন্তু না। তবে কোচিং-
এ ভর্তি হওয়ার পর শহরে ছাত্রদের দেখে তার
মনোবল ভেঙে পড়েছে।

দূর আকাশে এখনো অখণ্ড লাল লাল মেঘ

এলোমেলো পায়চারী করছে। একটা লম্বা
নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ির দিকে তাকাল সিফাত। ৬টা
বেজে ৯ মিনিট। এরই মাঝে মাসজিদের শহর
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেওয়া শুরু করেছে।
সিফাত দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।
সন্ধ্যার পর বেশ কিছুক্ষণ মাঝের সাথে কথা
বলল সিফাত। মন্টা বেশ ফুরফুরে লাগছে
এখন। মাঝের কথায় যেন জাদু আছে। মনের
আকাশে জমা যাবতীয় বিষণ্ণতা সেই জাদুর
বুলিতে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়। কিন্তু বাবটা
যেন কেমন তার! রসক্রমহীন কাঠখোটা এক
লোক। তবে স্বত্বাবে গন্তব্য হলেও সিফাত
জানে, তার কাঠখোটা চেহারাটার আড়ালে শুধু
আর্দ্র ভালোবাসার নদী।

**ফোন্টা কেটে দিয়েছে বেশকিভুক্ষণ
হলো। বাবা ফোন রাখার আগে বলেছে,
'চিন্তা করিস না, রেজাল্ট ভালো হবে।'
বাবার এই আশাই সিফাতকে বারবার
বিড়ুত্তন্ত্র ফেলে। যদি রেজাল্ট খারাপ
হয়, তবে তো এই আশায় গুড়েবালি।
বাবাকে তখন কী জর্বাব দেবে সে?**

২.

ঘণ্টাখানেক হলো রেজাল্ট বেরিয়েছে। এই
অবিশ্বাস্য রেজাল্ট দেখে কিংকর্তব্যবিমৃত হয়ে
বসে আছে সিফাত। অসহ্য কান্নার দল অবিরত
দলা পাকিয়ে আসছে গলার ভেতর। জীবনের
এই চরম অপ্রিয় সত্যের জন্য মোটেও প্রস্তুত
ছিল না সো। গোল্ডেন এ+ না পেলেও সাধারণ
এ+ তো কোনোভাবেই মিস হবার কথা ছিল না।
তাই বলে ফেইল! তাও আবার রসায়নে!

অনেকক্ষণ যাবৎ মোবাইলে কেঁপে কেঁপে রিং
হচ্ছে। নিশ্চয়ই আত্মীয়-স্বজনরা কল দিচ্ছে।
বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে ফোন্টা বক্ষ করে দিল
সিফাত। বাবার সাথেও কথা বলার মুখ নেই
তার। এই মুহূর্তে মরে যেতে পারলেই বোধহয়

বাঁচা যাবে। এসব আবোলতাবেল ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। একটু পরেই পাশের রুম থেকে জিদান ভাই আসলো।

- কী রে, শুনলাম রেজাল্ট খারাপ হওয়াতে মন খারাপ করে আছিস?

বাম হাত দিয়ে বিঞ্চস্তু চেহারাটা একটু মুড়ে নিল সিফাত। জগতের সমস্ত নিষ্ঠাঙ্কতা থেন তার কর্তৃকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই মুহূর্তে কান্না ছাড়া আর কিছুই বের হবে না। তারচেয়ে চুপ থাকাই ভালো। দাঁতে দাঁত চেপে রসে রাইল সে।

- আরে, মন খারাপ করিস না। এটা নে; খেয়ে সপাং করে শুয়ে পড়। দুশ্চিন্তা কেটে যাবে!

কথাটা বলেই ছেট একটা ট্যাবলেট সিফাতের পকেটে ঢুকিয়ে দিল জিদান ভাই। তারপর সিফাতের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘জীবনটাকে এনজয় করতে শেখ, ব্যাটা।’ এই বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

জিদান ভাই রুম থেকে বেরবার সাথে সাথেই একটা উৎকৃষ্ট পোড়া গঞ্জ সিফাতের পেটের ভেতর চুকে গেল। এই পোড়া গঞ্জটা আগেও কয়েকদিন তার শরীর থেকে পেয়েছে সে। প্রতিবারই সিফাতের বমি হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

সিফাতের রুমমেট রাসেল একদিন বলেছিল, সে যেন জিদান ভাইয়ের থেকে দূরে থাকে। কেন বলেছিল, সেটা অবশ্য সিফাত জানে। কিন্তু আজ এই লোকটাকে তার বড় আপন মনে হলো। মা-বাবার সাথে লজ্জায় কথা বলতে পারছে না সে। এই সময়ে এমন একটা ভরসার জায়গা সিফাতের খুব দরকার ছিল।

দ্রুত ট্যাবলেটের খোসাটা ছিঁড়ে এক ঢোকে গিলে ফেলল সিফাত। মনে মনে ভাবল, ‘একবার খেলে কিছুই হবে না।’ কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই রাজ্যের ঘুম এসে ভর করল তার চোখে।



৩.

সন্ধ্যা সাতটা। এক ঘুরেই চার ঘণ্টা শেষ। জিদান ভাইয়ের ডাকে কোনোমতে টেনেটুনে চোখদুটো মেলল সিফাত। উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে আসতেই জিদান ভাই বলে উঠল,

- লেটস গো, মাই বয়। চল, হেঁটে আসি।

সিফাত অমত করেনি। বিপদের সময় এই খারাপ লোকটাকেই তার পরম বন্ধু মনে হচ্ছে। তাই কিছু না বলেই উঠে পড়ল।

ঘটাখানেক হেঁটেছে ওরা। দু’কাপ চা-ও খেয়েছে। হোম্পেলে ফেরার সময় সিফাতের দিকে একটা সিগারেট বাঢ়িয়ে দিয়ে জিদান ভাই বলল,

- একটা সুখটান দে, ব্যাটা। দেখবি, দুঃখ-কহ্ত সব কোথায় বেরিয়ে আবে!

- না, ভাই। আপনিই খান। আমি এসবের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।

একটু নাক সিটকে উন্নর দিল সিফাত।

- আহারে, বাচ্চা ছেলেটা! তুই এখন বড় হয়ে গেছিস। এসব সামান্য ব্যাপারে এত মাথা ঘামালে চলে? একটা সুখটান দিয়েই দেখ।

কথাটা বলে সিফাতের মুখের কাছে ধরল সিগারেটটা। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিগারেটটা হাতে নিল সে। তারপর ‘একবার খেলে কিছুই হবে না’ ভেবে আচমকা দিল একটান। অতঃপর বোকা মাছগুলোর মতো সে-ও বড়শিতে ধরা পড়ল।





গ্রাফিক ডিজাইনের যাদেয়ামাঞ্চল

তাত্ত্বিক মন জাগিত

এই মুহূর্তে অঞ্চল সময়ের জন্য ‘মোলো’ বক্স করো। প্রচলনে চোখ বুলিয়ে তারপর আবার এখানে আসো। কী দেখলে? একটা সুন্দর রঙিন ডিজাইন, তার ওপর সুন্দর করে ‘মোলো’ লেখা। আচ্ছা বলো তো, প্রচলনের জায়গায় শুধু একটা সাদা কাগজে বড় করে ‘মোলো’ লিখে দিলে কী এমন হতো!

ঠিক ধরেছ, এখনকার মতো এটটা সুন্দর লাগত না। হয়তো তুমি মোলোর এই সংখ্যা কিনতেও চাইতে না। এই যে প্রচলনে লেখা, ছবি, রঙ, সবকিছুর মিশেলে সুন্দর একটা ডিজাইন তোমার সামনে এসেছে, এর নামই গ্রাফিক ডিজাইন।

মূলত কিছু ছবি, অক্ষর, রঙ, আকৃতি (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃক্ষ ইত্যাদি) মিলিয়ে কোনো বার্তা প্রেরণ করার (communication) প্রক্রিয়াকেই গ্রাফিক ডিজাইন বলে। টিভিতে দেখানো বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে শুক্রবারে মাসজিদে বিলানো লিফলেট—সবই গ্রাফিক ডিজাইনেরই অংশ। আজকাল গ্রাফিক ডিজাইন নেই, এমন জিনিস কল্পনা করাও দুষ্কর।

গ্রাফিক ডিজাইনের মূল কাজ হলো মানুষের সাথে সঠিকভাবে কমিউনিকেশন করা। যেমন ধরো ‘মোলো’ ম্যাগাজিনের প্রচলন। এই প্রচলনে এত সুন্দর করে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে তোমারা ম্যাগাজিন পড়তে উদ্বৃদ্ধ হও। যদি প্রচলন দেখে তোমাদের ম্যাগাজিনটা খুলে দেখতে মন চায়, পড়তে মন চায়, তাহলে যিনি প্রচলন করেছেন তিনি সার্থক।

এবার চলো, গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আরও কিছু গল্প করি তোমাদের সাথে।

গ্রাফিক ডিজাইন কেন শিখবে? ?

আজকের পৃথিবীতে গ্রাফিক ডিজাইনের বিকল্প নেই। গ্রাফিক ডিজাইন শিখে তুমি যেকোনো কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে ফিল্ম্যাণ্সিং করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারবে। গ্রাফিক ডিজাইন শেখা শুরু করলে UI/UX Design, Motion Graphics, Editing এসব কিছুও শেখা সহজ হয়ে যাবে।



কীভাবে শিখবে গ্রাফিক ডিজাইন?

প্রথমত, ডিজাইন করা খুব মজার একটা কাজ। তুমি যে কাজটা করতে চাচ্ছ, এ জন্য তোমাকে সাধুবাদ। এবার শেখার পালা।

অনলাইন থেকে তুমি ফ্রিতেই গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে পারো। অথবা কোনো ইলাটিউটেও টাকা দিয়ে কোর্স করতে পারো। কিন্তু আমি মনে করি, তুমি যেহেতু এখনো ছাত্র, তোমার অনলাইন থেকেই শেখা উচিত। তোমার হাতে অনেক সময় আছে। এ সময় নিজে নিজে শিখতে পারলে ভবিষ্যতে তা ভালো কাজে দেবে। তা ছাড়া, তোমার সুবিধামতো সময়ে শিখতে পারবে।

ডিজাইন করার জন্য প্রথমেই তোমাকে কিছু বেসিক সম্পর্কে জানতে হবে, তাই না? গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিক সম্পর্কে জানার জন্য ইউটিউবে সার্চ দিতে পারো, ‘Graphic Design Basics’ লিখে।

গ্রাফিক ডিজাইনের হাতেখড়ি হয়ে যাবে এ থেকে। এবার কিছু ডিজাইন করার পালা। ডিজাইন করার জন্য তোমার লাগবে ডিজাইন সফটওয়্যার।

ডিজাইন করার অনেক সফটওয়্যার রয়েছে। তোমার যদি কম্পিউটার থাকে তাহলে খুবই ভালো। কিন্তু কম্পিউটার না থাকলেও সমস্যা নেই, মোবাইলেই ডিজাইন শুরু করতে পারবে তুমি।

ডিজাইন করার অনেক সফটওয়্যার রয়েছে, সেগুলো ডাউনলোড করে চালানো শুরু করো। কীভাবে চালাতে হয়, এ সম্পর্কে ইউটিউবে হাজার হাজার টিউটোরিয়াল পাবে।



কিছু সফটওয়্যারের তালিকা—

কম্পিউটার :



মোবাইল :



সফটওয়্যার শেখা ব্যাপার না; ব্যাপার হলো সৃজনশীলতা দিয়ে ডিজাইন তৈরি করতে করা। সে জন্য অন্য যারা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করছে, তাদের ডিজাইন দেখতে পারো। তাদের সাথে কথা বলতে পারো, পরামর্শ নিতে পারো।

ফেসবুকে Do Halal Design, Make Islamic Design সহ অনেক ভালো ভালো গ্রুপ রয়েছে, সেগুলোতে জয়েন করতে পারো।

হ্যাপি ডিজাইনিং!





লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি

(২য় পর্ব)

মুহাম্মদ নাফিস নাওয়ার

৩। সহজ কথা বলতে হবে সহজে!

শিরোনামে যদিও বললাম যে, সহজ কথাই সহজে বলতে হবে, কিন্তু বিষয়টা শুধু এমন না। চেষ্টা করতে হবে যাতে সবগুলো কথাই সহজ ভাষায়, আরামসে বলা হয়। আমরা প্রথম পয়েন্টে বলেছি অনেক অনেক পড়তে হবে, তাহলে আমরা লিখতে শিখব। এখন এমন হতে পারে যে, আমরা এমন কোনো লেখকের লেখা পড়লাম, যিনি লিখেন অনেক কঠিন ভাষায়। কিংবা যার লেখার বিষয় হচ্ছে বেশ ভারিক্কি। আমরা যদি তখন সেভাবে লিখতে শুরু করি, তাহলে তো মুশকিল!

একটা উদাহরণ দিই, তাহলে বুবাতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ। ধরো, আমরা দেখছি যে, কেউ খেতে বসেছে বা খাচ্ছে। তো আমরা বিষয়টাকে কীভাবে লিখব?

[১] প্রথম পর্বটি পড়ে নাও এখান থেকে- <https://tinyurl.com/lekhalekhi01>

১। লোকটি খেতে বসেছে/লোকটি খাচ্ছে।

২। সে এখন খাবে/সে খাচ্ছে।

৩। মানুষটি খেতে বসল/মানুষটি এখন খাবে/মানুষটি এখন খাচ্ছে।

ওপরের যেকোনো একভাবেই কথাটি বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা ওপরের উদাহরণের মতো না বলে এভাবে বলি—

লোকটি/মানুষটি/সে খাদ্যগ্রহণ করতে চেয়ারে বসল।

অথবা,

লোকটি/মানুষটি/সে ক্ষুধা নিবারণ করতে বসল।

কেমন লাগছে, বলো তো? খুব ওজনদার, তাই না? এভাবে না বলে খুব সহজ ভাষায় ঘটনাটা আমরা লিখে ফেলতে পারি।

তোমার লেখা মানুষ যত সহজে বুবাবে, যত

সহজে তোমার কথা মানুষকে তুমি বুঝাতে পারবে, তত বেশি তোমার লেখা মানুষের কাছে ভাল্লাগবো। আমরা এরকম লেখার জন্য একটা নাম ব্যবহার করে থাকি—মেদইন লেখা। মানে লেখার মধ্যে কোনো তেল-চর্বি-ভুঁড়ি নেই। একদম ব্যবারে, ফ্রেশ! তরতর করে পড়ে ফেলা যায়।

তাই ভাইয়ারা ও আপুরা, এসো আমরা চেষ্টা করতে থাকি, কীভাবে সহজ সব শব্দে সহজে নিজের মনের কথাগুলো লিখে ফেলা যায়। সহজিয়া লেখা মানুষের মনে দাগ কাটে বেশি। যদিও সহজ কথা যায় না বলা সহজে, কিন্তু লিখতে লিখতে আর চেষ্টা করতে করতে যে আমরা এই চমৎকার গুণটি আয়ত্ত করে ফেলতে পারব না, সেটা কি কেউ বলেছে না কি?

আর কেউ বললেই কী! আমরা সেসবকে থোড়াই কেয়ার করি। অতএব, নেমে পড়ো লেখার ময়দানে থাতা-কলম-কীবোর্ড নিয়ে আর লিখতে থাকো নিজের কথাগুলো। লিখো আর পড়ো। দেখো, সেটা পড়তে সহজ লাগে কি না, তরতরিয়ে পড়ে ফেলা যায় কি না। যদি না যায়, তবে আবার চেষ্টা করো। এভাবে করতে থাকলে দেখবে, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ লেখা

বাবাজি সুন্দর হবেই হবে। সুন্দর না হয়ে যাবে কই ব্যাটা, হ্র?

যে মালী তার বাগানে যত যত্নের সঙ্গে, সময় নিয়ে কাজ করবে, তার বাগান তত সুন্দর হবে—এটা তো আমরা সবাই-ই বুঝি। বুঝি কি না? অবশ্যই বুঝি। আমাদের লেখার খাতা ঠিক সেরকমই এক বাগান। যত খাটবে, যত সময় দেবে, তত বেশি ফুলেফুলে ভরে উঠবে তোমার এই বাগান। মৌ মৌ করে শ্রাগ ছড়াবে ফুল। সেই সুবাসে সুরভিত হবে আশেপাশের সবাই, সুরভিত হবে তুমি নিজেও।

তো বন্ধুরা, অনেকের বকবক করে ফেললাম। তোমরা আবার রাগটাগ কোরো না যেন! মোলোতে তোমাদের লেখা বেশি বেশি আসুক, তোমাদের লেখার সুরভিতে মোলো সোল্লাসে মেতে উঠুক। এত বেশি লেখা আসুক তোমাদের, যাতে করে তোমাদের সেই সেই সব লেখার ভিত্তে হারিয়ে যায় আমাদের এসব পঁচা বকবকানি আর বোরিং বোরিং সব লেখা। তোমাদেরই পথ চেয়ে আছে মোলো, চেয়ে আছে পুরো উস্মাহ। তোমরা সাড়া দিছ তো?

মুচকি থমা সুরাষ্ট!

পরীক্ষার হলে বিনিন ও গালিব লেখা বাদ দিয়ে গুরু করবে।

শিক্ষক : কী ব্যাপার! তোমরা লেখা বাদ দিয়ে গুরু করছ কেন?

গালিব : স্মার, পরীক্ষার এসেছে পলাশীর মুক্ত সম্পর্কে আলোচনা করো।

শিক্ষক : তো?

বিনিন : তাই আমরা আলোচনা করাই।

(অডিওনেশন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

গোয়েন্দাগিরি একজ্যোট

প্রশ্ন ১ :

প্রফেসর জামশেদ, নামকরা রসায়নবিদ, দুর্ভাবণশত
একদিন তিনি নিজের লাবে স্ফন হলেন। ক্রাইম
স্ট্রেটে একবাত্র প্রয়াণ ছিল একটি কাগজের টুকরো,
যাতে কিছু রাসায়নিক পদার্থের নাম দেখা ছিল।

পদার্থগুলো ছিল নিকেল, কার্বন, অরিজেল, লাভালাই এবং সালফার। হ্যাতের দিন তার
সাথে মাত্র তিনজন মানুষ এবেছিল, সহবরই বিজ্ঞানী নিকোলাস, নিকোলাসের তাই
কেন্দ্রেইজ এবং জামশেদের তাই প্রফেসর নিলয়। সঙ্গে সঙ্গে শুনিকে প্রেরণার করে
পুলিশ। তারা কীভাবে জানল, এটা কে?

প্রশ্ন ২ :

ডা. জহির তর চাচ আফজালের সাথে খালতেন। আফজাল চাচ বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।
জহির তর চাচৰ ঘৰ প্রিয় ইণ্ডায় আফজাল চাচ তাৰ জন্ম অনেক সম্পদ, জমি জমাৰ বাবঢ়া কৰে
ৱেষ্টেছেন। হ্যাঁখ আফজাল চাচ তাকে বলালেন, জহির, আমৰ এক পুত্ৰোৱে দুশ্যমন তাৰ দলবল নিয়ে
আহাকে মাৰতে আসছো। তুই আমাকে লুকালোৱে জায়গা বলো।

ডা. জহির ১৫ ফুট লম্বা একটা প্লাস্টিক পাইপ ধানে বলাল, চাচ, আমদেৱ এই পুকুৰটোৱে গভীৰতা
বজ়োড় দশ ফুটেৰ মতো আপনি যদি পুকুৰেৰ তলদেশে শুধু খাবেন এবং তাই পাইপ দিয়ে
শুস প্ৰশাল দেন, তবে আপনাৰ শত্ৰু আপনাকে কৰবলৈ খুঁজে পৰে না। আপনাৰ শত্ৰুৰ চলে গোল
আৰি আপনাকে ডাক দিতে পুকুৰে নামব।

আফজাল চাচ শুধি হয়ে পুকুৰে নেমে গেল। কচেক ঘণ্টা পৰ গ্ৰামেৰ কঠোৰজন চুৰুৰি পুকুৰেৰ পাশ
দিয়ে গেলে আফজালেৰ লাশ পুকুৰে তেসে থাকতে দেখে। সৰুকিছু পৰ্যবেক্ষণ কৰে ও ডা. জহিৰেৰ কথা
অনুমানী হ্যাত অভিহোগে পুলিশ ডা. জহিৰকেই প্ৰেক্ষতাৰ কৰে। কেন?

কিশোৰ বয়সে গোয়েন্দাগিৰি কৰতে কেবল লাগে? কুৰ ভালো লাগে নিশ্চয়ই। তোমাদেৱ
গোয়েন্দাগিৰি হতিঙা বাধাই কৰতে আমৰা নিয়ে এলৈছি ধাৰাবাহিক আৱৰণ— রহস্যঞ্চ।
ৱহসেৱ জট কুলে পাঠিয়ো দা ও quiz.sholo@gmail.com এই টিপ্পোনায়। আৱ সৱাৰ পঁচজন
গোয়েন্দা জিজ্ঞে নাও আকমনীয় পুৰণত। উপৰ পঠাতে হৰে ১০ আগস্ট, ২০২৩ এৰ মধ্যে।

★ গৃহসংস্থাৰ 'বহসাজ্ঞ' বিজয়ীৰ হলো : ★
মোঃ রাহাদ উল্লাহ, ফারদিন মোৰ্সদ, সৰ্দিকুল রহমান, নাজিম, মুহাম্মদ বিলাহ, ★



ଆପରକେତ୍ତ ମିରିଜ୍ : ଆଗେ ଯଦି ଜାନଖାଲ ଥିଲୁ !

ଲୁଟ୍ ମଡେସ୍ଟ୍

গোকাল বাসে করে যাচ্ছি। একটা স্টপেজে ১০/১২ জন স্টুডেন্ট উঠল। প্রত্যেকের বয়সই ১৬/১৭ এর মতো হবে। দুপুরবেলা। অসময়। রাস্তাঘাটে তেমন ট্র্যাফিক নেই। বাসও খালি। বাসের মধ্যে আমরা সবাই বিমাচ্ছিলাম দুপুরের গরমে। ইউনিফর্ম পরা ওরা উঠামাত্রই নিজীব বাসটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। হই-হটগোলে ভরে উঠল বাস। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটে বসা বন্ধুদের কাছে ভাড়া আদায় করতে লাগল কন্ডাষ্ট্রির সেজে। আরেকজন নিল হে঳ারের ভূমিকা। সামনের স্টপেজগুলোর নাম ডাকছিল সে। ২/৩ জন নিজেদের মধ্যে উচ্চস্বরে ক্লাসের কোন স্যার কী বলেছে এমন মজার মজার গল্প করছিল। বাকিরা খেলছিল এক সিট থেকে অন্য সিটে ছোটাছুটির মজার খেলা।

আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম। নিজের ওই বয়সটার কথা মনে হচ্ছিল। আহা, এই ভাবনাচিন্তাহীন বয়সটা যদি আবার ফেরত পেতাম। তবে চিৎকার চেঁচেমিচিতে হালকা বিরক্তিও কাজ করছিল। আসলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে দুনিয়ার কৃৎসিত কঠোর বাস্তবতায় হাদয়ের স্বচ্ছ, নির্মল ছেলে মানুষটা মরে যাচ্ছে। ক্লেদাঙ্ক কল্যাণতা স্থান করে নিচ্ছে সেই স্থানে। বাসের অন্য যাত্রীরা সবাই আমার চাইতেও বড়। তারা আমার চাইতেও বেশি বিরক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের চোখেমুখেও বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছিল না।

এই কিছু না বলতে চাওয়াটাই আসলে আমাদের বড়দের সমস্য। আমরা মুখ ফুটে কিছু বলি না। আদবকেতা শেখানোর চেষ্টা করি না। কিন্তু আবার পেছনে পেছনে ছোটদের বেয়াদব, উগ্র বলি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে জীবনমুখি শিক্ষা দিতে। স্কুল-কলেজও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় আদব-কেতা শেখাতে পারে না বা শেখায় না। অনেক বড়বড় ভাবেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে বেয়াদব,

কিছু বলতে গেলে উলটো অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই চুপ করেই থাকি। কিন্তু এভাবে দূরে সরিয়ে দিলে আমাদের ভাই-বোনেরা, আমাদের সন্তানেরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে কীভাবে?

রাগারাগি না করে ধীরস্থির-শান্তভাবে ওদের বোঝালে ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন বুঝবে। পথের প্রভুহীন কুরুরের মতো ছেড়ে না দিয়ে একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমাদের উচিত ওদের কাছে টেনে নেওয়া। এই চিন্তা থেকেই এই সিরিজটা শুরু করা। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, আশেপাশের আরও মানুষদের অভিজ্ঞতার মিশেলে এই লেখাটা লেখা হয়েছে। ভাইয়া ও আপুরা, তোমাদের হয়তো কোনো কোনো পয়েন্ট এখন মেনে নিতে কিছুটা কষ্ট হতে পারে। তবে আর ১০/১২ বছর পর যখন এগুলোর কথা ভাববে, আশা করি তখন আমাদের কিছুটা হলেও বুঝবে। আমরাও তোমাদের মতোই ছিলাম। আমাদেরও কষ্ট হতো বড় ভাই-বোন, বাবা-মা, স্কুল-কলেজের স্যার বা ক্রিকেট মাঠের ক্যাপ্টেন ভাইদের কথা মানতো। বিদ্রোহ করতে মন চাইত। অনেকে করতও।

কিছু আদবকেতা :

১. বাস বা যেকোনো গণপরিবহণে এমন আচরণ না করা, যেন পাশের যাত্রীদের কষ্ট হয়। বিশেষ করে বন্ধুরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঘূরতে গেলে। তোমাদের এই বয়সে স্বভাবসূলভ একটু অস্থিরতা, চঢ়লতা থাকবেই। হই-হল্লোড় করা দোষের কিছু না। তবে তা যেন অন্যদের বিরক্তির কারণ না হয়।

২. বাসে অসুস্থ, বয়স্ক, শিশু ও নারীদের জন্য সিট ছেড়ে দেওয়া। আমরা পুরুষ। আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো শত কষ্ট হলেও অন্যদের আগলে রাখা। দুঃখ সয়ে নিয়ে হাসিমুখে অন্যদের সাপোর্ট করা।

৩. কেউ বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা

বললে, তা গোপন রাখা। অন্য কাউকে—সে যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন—না বলা।

৪. সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় যথাসন্তোষ কর শব্দ করা।

৫. পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করা।

৬. কাউকে অসময়ে (যেমন : সালাতের সময়, বিশ্বামৈর সময়, রাত ১০ টার পর ও সকাল ৯ টার আগে) একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ফোন না করা। একবার ফোন করার পর ফোন না ধরলে আর ফোন না দেওয়া। প্রয়োজনে ম্যাসেজ দিয়ে রাখা।

৭. শুধু অনলাইনে পরিচিত, স্বল্প পরিচিত মানুষকে (সেলিব্রেটি, আলিম হলেও) একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান না করা।

৮. অনলাইনে অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত, সেলিব্রেটি বা ব্যক্তি মানুষদের ইনবঙ্গে শুধু সালাম দিয়ে চুপ করে না থেকে প্রয়োজন বলে ফেলা। ম্যাসেজের রিপ্লাই পেতে দেরি হলে তাড়াহৃত্তা না করা। বিরূপ ধারণা পোষণ করবে না, ভাইয়া/আপু। উন্নারা প্রচুর ম্যাসেজ পান। উন্নারা যদি আমাদের সবার ম্যাসেজের রিপ্লাই দিতে যান, তাহলে লেখালেখি বা অন্য প্রোডাক্টিভ কাজ কখন করবেন, বলো?

৯. হাই, হ্যালো করার জন্য ব্যক্তি মানুষদের অনলাইনে নক না দেওয়া।

১০. কারও ফোন, কম্পিউটার বা যেকোনো জিনিস ব্যবহারের আগে তার অনুমতি নিয়ে নেওয়া। ‘ভাই, চাবিটা দেন! একপাক ঘুরে আসি’ – এভাবে ছটফট করে বাইক/সাইকেল ধার না চাওয়া। সম্পর্ক খুব ভালো, কাছের ভাই বেরাদর হলেও।

১১. টাকা ধার না করা। ধার করলে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া। দিতে দেরি হবার সন্তান থাকলে ধার নেবার সময়ই তা জানিয়ে রাখা।

লেনদেনে দুইজন সাক্ষী রাখা। লিখিত দলিল রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

১২. বই ধার নিলে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া।

১৩. কুমে প্রবেশের আগে নক করা, অনুমতি নেওয়া। খুব ভালো হয় সালাম দিতে পারলে।

১৪. অন্য কারও কুমে প্রবেশের সময় বা বের হবার সময় দরজা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ দরজা খোলা রাখলে খোলা রাখা। বন্ধ থাকলে বন্ধ করে যাওয়া। যত কম শব্দে পারা যায় দরজা বন্ধ করা।

১৫. পাবলিক প্লেইসে ভিডিও দেখতে হলে হেডফোন ব্যবহার করা, যাতে অন্যের কোনো সমস্যা না হয়।

১৬. টিকেট কাউন্টারসহ অন্যান্য স্থানে সিরিয়াল মেনে লাইনে দাঁড়ানো।

১৭. রিকশা নেবার আগে ভাড়া ঠিক করে নেওয়া।

১৮. সামনে বসে থাকা কোনো ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের সময় ফোন ব্যবহার না করে তাকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।

১৯. বন্ধুদের মধ্যে গুটিবাজি না করা (গীবত, কৃটনামী ইত্যাদি)।

২০. লিফটে চুপ চাপ থাকা। হই-হটগোল বা ফোনে কথা না বলা। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো কথা না বলা।

২১. লিফটে অন্যদের সাথে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা। গা বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

২২. লিফটে উঠার জন্য তাড়াহৃত্তা বা ঠেলাঠেলি না করা। ভদ্রভাবে শান্তশিষ্টভাবে সিরিয়াল মেনে লিফটে উঠা।

২৩. বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার সময় সীমা বজায় রাখা। সে মন খারাপ করতে পারে এমন বিষয়ে মজা করা, পঁচানি দেওয়া - ইত্যাদি করা

উচিত না। আবার কার সঙ্গে কতটুকু মজা করা
যাবে এই সীমাটাও বোঝার চেষ্টা করা।

৬৪. কোনো বন্ধুর কাছ থেকে জোর করে
কোনো কিছু না খাওয়া বা ট্রিট আদায় না করা।
হতে পারে তার অর্থিক সমস্যা চলছে। সে
নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্য অনেক কষ্ট
করে টাকা জোগাড় করবে। তোমার বন্ধুকে তো
তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তাই না?

৬৫. বই, সুগন্ধি ইত্যাদি যে-কারও কাছে
গিফট না চাওয়া। এটাতে সেই ভাই/বোন মুখের
ওপর কিছু না বললেও মনে মনে বিরক্ত হতে
পারে। আর চেয়ে নিলে তো সেই জিনিস আর
গিফট থাকে না, তাই না?

এই দেখো! দশটা পয়েন্ট লিখতে চেয়েছিলাম।
পঁচিশটা হয়ে গেল। আজকে এ পর্যন্তই
থাক। সামনে আরও বিষয় আলোচনা করব
ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়গুলো নিজের জীবন
থেকে ঠেকে শেখা। আশা করি তোমাদের কাজে
লাগবে। ভালো থেকো। সুস্থ, সুন্দর, তরতাজা,
সজীব হয়ে বেড়ে উঠো...

টা টা।

“

ইমানের সত্ত্ব অথবা ষাট অপেক্ষা কিছু
বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম
শাখা ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ বলা এবং
সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক
জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা
ইমানের একটি শাখা।”

[বিষাদুস মালিহীন, হাদীস নঃ-৬৮৮]

ভুল হলে ফুল হলো

ওমর ইবনে সাদিক



ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଗୁଣେ ପଥଗଶ୍ତି ରାତ ପାର ହୟେ ଗେଲା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମାନୁଷଟା ଏଖନୋ ତାଁର ସାଥେ କଥା ବଲଛେନ ନା। ତିନି ସଥିନ ସାଲାତେ ଦାଁଡାନ, ଉନି ତଥିନ ତାଁର ଦିକେ ଏକଟୁ ତାକାନ। ତିନି ସାଲାମ ଫେରାଲେ, ଉନି ଚୋଥ ସୁରିଯେ ନେନ। ଚୁପିସାରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଛୋଟ ଶିଶୁର ମତୋ ନୀରବ ଚାହନି ଦିଯେ ତିନି ତାକିଯେ ଥାକତେନ ଏହି ଆଶ୍ୟ— ଏହି ବୁଝି ଉନି ତାକାଲେନ ଆମାର ଦିକେ। ଉନାର ମଜଲିସଗୁଡ଼ିଲୋତେ ଆଗେ-ଆଗେ ସାଲାମ ଦିଲେନ, ଆର ଏକବୁକ ଆଶା ନିଯେ ତାକିଯେ ଥାକତେନ ଉନାର ଏହି ପବିତ୍ର ଠୋଟ୍ଟଜୋଡ଼ାର ଦିକେ। ଏକଟୁ ଯଦି ନଡେ... ଆମାର ସାଲାମେର ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ପାଇ...

ଶୁଧୁ ପ୍ରିୟ ମାନୁଷଟାଇ ନା, ଏକେ ଏକେ ସବ ସଙ୍ଗୀ-ସାଥି ଉପେକ୍ଷା କରତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ତାଁକେ। ହଦ୍ୟ-ସାଗରେ ଉପଚେ ପଡ଼ା ବ୍ୟାଥାର ଟେଉ ନିଯେ ତିନି ଗେଲେନ ଚାଚାତୋ ଭାଇୟେର କାହେ। ସାଲାମ ଦିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପେଲେନ ନା। ତବୁଓ ବୁକେ କ୍ଷିଣ ଆଶା ନିଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, ‘ତୁମି କି ବିଶ୍ୱାସ କରୋ ଯେ, ଆମ ଉନାକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସି? ତୋମାକେ ଆଜ୍ଞାହର କମ୍ବ ଦିଯେ ବଲଛି’ ଚାଚାତୋ ଭାଇ ଆଶାନୁରୂପ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା। ପାଥରଚାପା କଟ୍ଟ ନିଯେ ଫିରେ ଏଲେନ ସେଖାନ ଥେକେ।

ରାତରେ ପର ରାତ କେଂଦେଇ ଗେଛେନ ତିନି। ପ୍ରତିଟା ରାତଜାଗାୟ, କାନ୍ନାର ପ୍ରତିଟା ଫୋଟାୟ, ପ୍ରତିଟା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେଛିଲେନ ନତୁନ ଏକ ଭୋରେ। ଯେଇ ଭୋରେ କୋନୋ କଟ୍ଟ ଥାକବେ ନା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ହଦ୍ୟେ ଉନି ଆବାର ଆମାୟ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ନେବେନ। ଉନାକେ ଆବାର ଆମି କବିତା ଶୋନାବ। ଉନି ମୁଢ଼େର ମତୋ ଆମାର କବିତା ଶୁନବେନ। ଦୁଆ କରବେନ ଆମାର ଜନ୍ୟ।

ପଥଗଶ୍ତମ ଭୋରେ ତିନି ଫଜର ସାଲାତ ଆଦାୟ କରଲେନ। ମନେ ହଲ୍ଲୋ, ପୁରୋ ପୃଥିବୀ କେମନ ଯେନ ସଂକୁଚିତ ହୟେ ପଡ଼ିଛେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଉନାର କାହେ ଚିରଅଚେନା। ବିଶାଳ ଏକଟି ପାହାଡ଼େର ଓପର ଥେକେ ଭେସେ ଏଲୋ ଏମନ କିଛୁ ଶବ୍ଦ, ଯେଗୁଡ଼ୋ ଛାପିଯେ ଗିଯେଛିଲ ଶଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏକେ କୀ ଶ୍ରେଫ ଶବ୍ଦ ବଲା ଚଲେ? ପଥଗଶ୍ତ ରାତରେ ହହ କରା କଟ୍ଟ, କାନ୍ନା,

ଶୁନ୍ୟତାକେ ଏକ ନିମିଷେଇ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଲ ଏହି ଶଦେରା :

“ହେ କା’ବ ଇବନୁ ମାଲିକ, ସୁସଂବାଦ ନାଓ!
ହେ କା’ବ ଇବନୁ ମାଲିକ, ସୁସଂବାଦ ନାଓ!”

ବଲାଟିଲାମ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ୍—ଏର ଆନସାର ଏବଂ କବି ସାହାବି କା’ବ ଇବନୁ ମାଲିକ ରଦ୍ୟାଲ୍ଲାହ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା। ନିଜେର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲେର କାରଣେ ତାବୁକ ଯୁଦ୍ଧେ ତିନି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରେନନି (ତାଁର ସାଥେ ଆରା ଦୁ’ଜନ ସାହାବି ଛିଲେନ, ଯାଁଦେରାଓ ଏକଇ ଭୁଲ ଛିଲ)। ଯୁଦ୍ଧ ଶେମେ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ୍ ଯଥନ ଫିରିଲେନ ଏବଂ ତାଁଦେର ଓଜର ଶୁନଲେନ, ଏରପର ପଥଗଶ୍ତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବଲେନନି ତାଁଦେର ସାଥେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ପଥଗଶ୍ତମ ଦିନେର ପର ଆଜ୍ଞାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ବାଣୀ ଆସେ ଯେ, କା’ବକେ ଏବଂ ତାଁର ମତୋ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାହାବିକେବେ କ୍ଷମା କରେ ଦେଓୟା ହେଁବେହେ। ଏହି ସଂବାଦ ଶୋନାର ପର ତିନି ଦୋଁଡ଼େ ଛୁଟେ ଗେଲେନ ପ୍ରିୟ ନବିଜିର କାହେ। ଖୁଶିତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଚାଁଦେର ଚେଯେ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୟେ ଉଠେଛିଲ ନବିଜିର ଚେହାରା। ଏରପର ବଲାଲେନ—“ସୁସଂବାଦ ନାଓ ଜୀବନେର ସରବର୍ଷେଷ୍ଠ ଦିନେର, ହେ କା’ବା”।^[1]

କୀ ଏମନ ଜିନିସ ଆହେ, ଯାର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ଆଜ୍ଞାହ ସୁବହାନାହ୍ ଓୟା ତାଆଲା କୁରାନେର ଆଯାତ ନାଖିଲ କରାର ମାଧ୍ୟମେ ତାଁଦେର କ୍ଷମା ନିଶ୍ଚିତ କରେଛେନ? ଚିନ୍ତା କରୋ, ଯୁଦ୍ଧେ ନା ଯାଓ୍ଯାର ମତୋ ଭୟାବହ ଅପରାଧେର ପରେଓ ଆଜ୍ଞାହ ସୁବହାନାହ୍ ଓୟା ତାଆଲା ଆଜ ତାଁଦେର ଓପର ସମ୍ପଦ! କିଯାମତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁଷେର ତିଳାଓୟାତେ ଭେସେ ଉଠିବେ ଉନାଦେର କଥା! କୀ ଏମନ କାରଣେ ହେଁବେହେ, ବଲୋ ତୋ!

ତାଓବା। ମୁଖିନେର ଏମନ ଏକଟି ହାତିଆର, ଯା ଦିଯେ ସେ ଶୟତାନେର କୋମର ଭେଣେ ଗୁଡ଼ିଯେ ଦିତେ ପାରେ। ଠୁଣକୋ ଏହି ଦୁନିଯାର ଆମରା କେଉ-ଇ ପାରଫେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦୁନିଯାର ମୋହେ ପଡ଼େ ଆମରା ଭୁଲ କରେଇ ଫେଲି। ଭୁଲ ହେୟାଟାଇ ଆମାଦେର ଫିରାତା। ରାସ୍ତୁଲୁହାହ୍ ବଲେଛେ, “ପତ୍ରେକ

[1] ସାହାବାୟେ କେରାମେର ଈମାନଦୀପ୍ତ ଜୀବନ, ଖଣ୍ଡ ୨

আদম সত্তানই পাপ করে। আর পাপীদের মধ্যে
তারাই সর্বোত্তম, যারা তাওবা করে।”^[২]

অর্থাৎ, গুনাহ করবেশি সবার দ্বারাই হয়; কিন্তু
গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই সবচেয়ে
উত্তম। গুনাহকে যে আঁকড়ে ধরে, জীবন তার
জন্য হয়ে উঠবে সংকীর্ণ।^[৩] একের-পর-এক
নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হবে তার কাছে থেকে।
সবশেষে অন্তর হয়ে উঠবে কঠিন। আর যারা
গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিশুল্দ
করে নেয় তাওবার পবিত্র ঝরনায়, আল্লাহর তো
তাঁদের আরও কাছে টেনে নেন। ভালোবেসে
তাঁদের শামিল করে দেন নিজের প্রিয় বান্দাদের
মধ্যে।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা
তাঁর কাছে তাওবা করে, এবং তিনি তাদেরকে
ভালোবাসেন যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে।”^[৪]

গুনাহে জর্জরিত অন্তর জানতেও পারে না
আল্লাহর তাঁকে কটটা ভালোবাসেন। আল্লাহ
নিজের অশেষ অনুগ্রহে তাঁকে দান করেন
কল্পনুন সালীম। যেই কলবে ব্যাথা জমে না, যেই
কলবে কান্না বারে মুক্তো হয়ে।

ভাই আমার, বোন আমার, গুনাহ হয়ে গেলে
তাই বিলম্ব কোরো না। সাথে সাথেই তাওবা
করো। তাওবার বৃষ্টিতে ধূয়ে ফেলো হৃদয়ের
সমস্ত পক্ষিলতা। প্রস্তুত করো এক কল্পনুন
সালীম, যার পুরস্কার সুবিশাল জামাত! আসমান
এবং জমিনের চেয়েও বিশাল জামাত!

[২] তিরমিয়ি, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৪৯৯

[৩] সূরা হ-হা, ২০ : ১২৪

[৪] সূরা বাকারা, ২ : ২২২



ওগো দয়াময়

মামু কবিতা

শাহজাহ সখার, পাপ হতেছে

মুগ্ধের লেই তু

ক্ষমা করো ল্যা করো

ওগো দয়াময়।

দুর্দার মে হে পথে

কাটে রাত মিল

ক্ষণে ক্ষণে বাতু তাহি

জীবনের কথ।

দৃঢ়াপ জুড়ে অশ্র করে

শালো নিয়ে নেই সঞ্চয়।

ক্ষমা করো ল্যা করো

ওগো দয়াময়।

অমানুক হয়ে গেতু

শাপে ঝুঁয়ে গই

আমরবিহীন তু

চিপ্পিত নই।

মুগ্ধ হলু এই কবরে

হোয়া না প্রকৃ নির্দয়

ক্ষণ পরে গো করো

ওগো দয়াময়।





দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একবারেই অপ্রয়োজনীয়?

লস্ট মডেষ্ট

SCHOOL UNIVERSITY

জীবনের এ পর্যায়ে এসে সদ্য দীনে ফেরা
কিশোর-তরঁগেরা মনে করে বসে,
জেনারেল লাইনের এই পড়াশোনাগুলো
একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এ সমস্যাটা
একেবারেই নতুন। এই সমস্যাটার কয়েকটা ধরন
আছে—

ক) এগুলো দুনিয়াবি পড়াশোনা। এগুলো
করলে আমার আধিবাতে কোনো ফায়দা হবে
না। কাজেই সব বাদ। আমার নিজের ভাসিটি
লাইফের একটা কথা মনে পড়ছে। এক
জুনিয়র এসে আমাকে বলছে—ভাই, আমার
এই পড়াশোনা করে কী লাভ! এর চেয়ে আমি
সারাদিন কুরআন পড়ব! কুরআনের এক হরফ
পড়লে দশটা করে নেবী!

খ) এই আর কিছুদিন পরেই ইবাম মাহদী
আসবেন। দাজ্জাল আসবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে।
কাজেই এত পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো
তো কোনো কাজেই আসবে না।

গ) আমাকে মাদরাসার শাহিখ আর মাওলানাদের
মতো আলিম হতে হবে।

প্রথম চিন্তাটার ব্যাপারে আসি। যদি তুমি বুবেই
থাকো যে, এই পড়াশোনা তোমার কোনো
কাজে আসবে না, তাহলে শুধু শুধু স্কুল-কলেজ
ভাসিটিতে থেকে ঠেলেছুলে খুব খাবাপ একটা
রেজাল্ট নিয়ে বের হবার জন্য অপেক্ষা করে
আছো কেন? বাবার টাকা নষ্ট করছ কেন? তুমি
তো এখন ফুলটাইম আধিবাতের কাজ করতে
পারছ না, তোমাকে ক্লাস করতে হচ্ছে, পরীক্ষা
দিতে হচ্ছে... এসব অনর্থক নয়? এসব কি
তোমার সময় নষ্ট নয়?

**যদি তুমি সত্যিকার অর্থেই এগুলোকে
অর্থহীন ঘনে করো, শিঙ্গা প্রতিষ্ঠান
থেকে বিদায় নাও। এক মুহূর্ত সময়
নষ্ট না করে ইসলামের জন্য ফুলটাইম
কাজ শুরু করে দাও।** তুমি ভাবছ তুমি
বেছে নেবে যুহদের জীবন, ছেঁড়া-তালি দেওয়া

কাপড় পরবে, কঢ়ি আর খেজুর খেয়ে দিন পার
করে দেবে ভবিষ্যতে। কিন্তু সেটা তুমি এখন
করছ না। কেন? যদি এগুলোই তুমি জীবনের
লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলো, তাহলে এখন এই
কাজগুলো করছ না কেন?

তুমি আসলে কী করছ? সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যমগুলোতে বিয়ে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা
অনর্থক মজা করছ, ‘দীন’ ভাইদের সাথে দীনি
আড়ার নামে অনেক সময় নষ্ট করছ, কয়েকদিন
পরপর রেস্টুরেন্টে গিয়ে দামি দামি খাবার খাচ্ছ,
সেলফি তুলে চেকইন দিচ্ছ... আবার ঘরে ফিরে
বলছ আমার এত টাকা-পয়সার দরকার নাই,
আমি যুহুদ অবলম্বন করব, এসব দুনিয়াবি
পড়াশোনা করার কোনো মানেই নেই ইত্যাদি।
তাহলে মোটের ওপর যে জিনিসটা দাঁড়াছে তা
হলো, **তুমি নিজের অলসতাকে দ্বীনের
গোড়কে ঢাকতে চাচ্ছ। তুমি একটা
অলস।** এটাই হলো উপসংহার।

দেখো, জীবন্যাপনের জন্য সামান্য কিছু হলেও
অর্থের দরকার পড়ে। অধিকাংশ কিশোর-
তরঁগদের এই বয়সটাতে টাকা নিয়ে ভাবতে
হয় না, বাবা বা অভিভাবকের কাছে চাইলেই
পাওয়া যায়। তাই অনেকেই এই ধোঁকায় পড়ে
যায়। টাকা-পয়সার দাস হওয়া যাবে না; তাই
বলে টাকা-পয়সার যে দরকার নেই জীবনে,
এমনও না। তুমি তো আর বাতাস খেয়ে থাকবে
না, তোমার স্ত্রী বা বাচ্চাকাচাকেও তো বাতাস
খাইয়ে রাখবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াকুল?
রিযিক নির্ধারিত?

রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহর
ওপর যথাযথ তাওয়াকুল (ভরসা) করো,
তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক
দেবেন যেমন তিনি রিযিক দেন পাখিদের। তারা
সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায়
ভরা পেটে ফিরে আসে।’[১]

[১] তিরমিয়ি, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৩৪৪; ইবনু
মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং : ৪১৬৮

পাখিরা আল্লাহর ওপর তাওয়াকুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা বিষিক অঙ্গে সকালে বেরিয়ে পড়ে। তাওয়াকুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াকুল।

এমন আরও অনেক হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আমরা উঠ ছেড়ে দিয়ে তাওয়াকুল করব না বেঁধে রেখে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমরা আগে উঠ বেঁধে নাও; তারপর তাওয়াকুল করো।’^[২]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাল্লাহ বলেন, ‘তাওয়াকুল হলো বান্দাকে তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা উপকৃত করে, তা অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা ক্ষতি করে, তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর হস্য-মন দিয়ে নির্ভর করা। আর এ নির্ভরতার সাথে সরাসরি উপায়-উপকরণের অবলম্বনও জরুরি।’^[৩]

দেখো, আল্লাহর ওপর তাওয়াকুল করে বসে থাকলেই যদি জীবিকা চলে আসত, তাহলে সাহাবিরা ব্যবসা করতেন না, কৃষিকাজ বা দিনমজুরি করতেন না। চুপ করে ঘরে বসে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ করতেন; আর আল্লাহ তাঁদের জন্য ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন! তাহলে তুমি কেন এমন চিন্তা করছ?

না তুমি ভাবছ—

১) সাহাবিরা তাওয়াকুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। আবু বকর, উমারের মতো মানুষ তাওয়াকুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। রদিয়াল্লাহ আনহুম।

অথবা

২) তাঁরা আল্লাহর ওপর তাওয়াকুল করতে পারেননি। তাওয়াকুল করতে পারলে ঠিকই

আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। তাঁদের আর ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধের গন্তব্যত, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা লাগত না?

উত্তর আমাকে দেওয়া লাগবে না। তুমি তোমার নিজেকে উত্তর দাও।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবিরা ইসলামের জন্য নিজেদের, নিজের স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা, অর্থ-সম্পদকে কুরবান করে দিয়েছেন। ইসলাম ছিল তাঁদের কাজে নাস্তার ওয়ান প্রায়োরিটি। তাঁরা অর্থের দাস ছিলেন না, অর্থ ছিল তাঁদের দাস। কিন্তু তাই বলে তাঁরা এরকম দিবাস্পন্ধ আর ফাঁপা রোমান্টিসিজমে ভুগে অলসতা করতেন না। তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন।

পড়াশোনা শেষে অখন তোমাকে আর পরিবার থেকে টাকা দেবে না, অখন তোমাকেই টাকা আয় করতে হবে, তখন আসলে বুঝতে পারবে যে, টাকা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এবং টাকা কামানো কোনো সহজ কাজ না।

তুমি ফুলটাইম দ্বিনের কাজও করলে না, আবার পড়াশোনা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট করলে না। জীবনের এই পর্যায়ে এসে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। তোমার লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই কঠিন পরীক্ষায় ঢিকে থাকা যায় না। দ্বিনের ব্যাপারে একটু একটু করে আপস করা শুরু হয়। আপস করতে করতে অনেককে ইসলামের অনেক মৌলিক জিনিস থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছি।

তাই এমন অলসতায় ডুবে থেকে না। অল্ল অল্ল করে হলেও পড়াশোনা করো, বিভিন্ন স্কিল বাড়াও। না হলে তুমি দুনিয়ার কাজেও আসবে না, ইসলামের জন্যও বোঝা হয়ে দাঁড়াবো।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

[২] তিরিমিয়, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৫১৭

[৩] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ : ৪/১৫



কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব ?

(২য় পর্ব)

আরিফুল ইসলাম

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা যখন প্রথম চাকরি পায়, বৎশের মুখ তখন উজ্জ্বল হয়। বাবা-মার জন্য এ যেন এক গৌরবগাঁথা বিজয়। সারাজীবনের কষ্টের অবসান হবে এই আশায় তাদের হৃদয় পরিত্পু হয়ে যায়। সন্তানরাও নিজেরা আবেগাপ্লুত হয়ে বলে থাকে, "আমার বাবা-মা সারাজীবন আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, বাকি জীবনে তাদের আর কষ্ট করতে দেব না।" বাবা-মায়েরা সারাজীবন যে বোৰা এতদিন বহন করেছে, এখন বোৰাটা ঘাড়বদল হয়ে সন্তানের কাঁধে এসে পড়ে।

নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়েদের আশা থাকে তাদের সন্তান বড় হয়ে বিৱাট বড়লোক হবে। দেশ-বিদেশে নামতাক হবে, দামি গাড়ি করবে, আলিশান বাড়ি করবে। বাবা-মা আগে থেকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাম রাজা-রানিদের নামে রেখে দেয়—বাদশাহ, সম্রাট, নূরজাহান, মমতাজ, আকবর, জাহাঙ্গীর ইত্যাদি। বড়লোক হওয়ার পরে নাম নিয়ে হীনমন্যতায় যাতে না ভুগতে হ্যাত।

চাকরিজীবি সন্তানের খুশির সংবাদে প্রতিবেশীর বাসায় দই-মিষ্ঠি নিয়ে যায়, পিতামাতার কলিজা বড় হয়। বাবা-মা সারাজীবনের লালিত স্বপ্ন এখন অনেক কাছ থেকে হাতছানি দেয়। কী আনন্দ!

সন্তান প্রতিমাসের খরচ এবং সর্বনিম্ন হাতখরচ রেখে, বাবার কাছে টাকা পাঠায়। বাবা-মায়ের অনায়াসে মাস চলে যায়। মাস যায়, বছর যায়। জীবন আপন গতিতে চলতে থাকে।

চাকরির বয়স বাড়ে, বেতন বাড়ে। সেই সাথে বাড়ি ভাড়া বাড়ে, চালডাল তরি-তরকারির দাম বাড়ে, সবকিছুর খরচ আগের চেয়ে বেশি। এ জন্য আগের চেয়ে বাড়িতে বেশি টাকা পাঠাতে হয়। তবুও কেমন যেন টানাটানি। আগে তো এর চেয়ে অবস্থা আরও ভাল ছিল। বাবা সন্তানকে ফোন করে চাকরির কেমন চলছে জানতে চায়।

সুমোগ-সুবিধা কেমন বাড়ছে, উপরি-ইনকামের ব্যবহা আছে কিনা জানতে চায়। প্রতিবছর প্রমোশনে যে পরিমাণ বেতন বাড়ে, তা এখন যথেষ্ট নয়। তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন—**একটা বাড়ি। স্বপ্ন সত্য করতে হলে ইনকামের অক্টো একটু বাড়াতে হবে। সঞ্চয়ী হতে হবে।**

প্রতি মাসে কিছু কিছু করে টাকা করে বাড়ির কাজটা শুরু করতে হবে। সন্তান এবার অধিক পরিশ্রম করে ভাগ্যের চাকা বদলাতে চেষ্টা করে। আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে। দুই টাকা খরচ কমিয়ে জমা করার চেষ্টা করে। কোথায় দুই পয়সা বেশি ইনকাম করা যায় সবসময় সেই চেষ্টা করে থাকে। খরচ আরও কমাতে হবে, এক পয়সাও অপচয় করা যাবে না। আগের মাসের চেয়ে এই মাসে বেশি টাকা পাঠাতে হবে। কিন্তু আগের চেয়ে বেশি টাকা পাঠালেও বাবা-মার সেই হাসিমুখ এখন নেই।

কয়েক বছর হাড়খাটা পরিশ্রম করে যে টাকা জমা হয়েছে তা বাড়ি করার জন্য কিছুই না। এভাবে অগ্রসর হলে আগামী ৩০ বছরেও বাড়ি করা হবে না। আমার বাবা-মা স্বপ্নের বাড়ি কি সত্যি সত্যি দেখে যেতে পারবে? চিন্তায় সন্তানের রাতে ঘুম আসে না।

কী করা যায়, কী করা যায়? তোমার বাবার বন্ধু একটা ভালো আইডিয়া দিয়েছে—হাউজ লোন। গত কয়েকদিন ধরে তোমার পরিবার তোমাকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছে লোন নিয়ে নেওয়ার জন্য। মাসে মাসে কিছু কিছু করে লোন পরিশোধ করে দিলে একসময় লোন শোধ হয়ে যাবে। তোমার বাড়িটা থেকে যাবে। একবার বাড়িটা হয়ে গেলে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। একটা এসেট হয়ে গেল, সবসময় কাজে লাগবে। কিন্তি কিন্তি! ওটা হয়ে যাবে—তোমাকে এভাবেই বুঝানো হয়েছে। এত চিন্তা-ভাবনা করে সবকিছু করা যায় না।

তোমার লাইফস্টাইল আগের চেয়ে অনেক কুরণ। খরচের লিস্টে নতুন আইটেম যোগ হয়েছে—হাউস লোন। ধার-দেনা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

তোমার অনেক পরিশ্রম বেড়েছে, আয় বেড়েছে। কিন্তু অভাব কমেনি, আগেও টানাটানি ছিল এখনও তাই। তুমি এক জটিল চক্রে ঘূরপাক খাচ্ছ। দারিদ্র্যের দৃষ্টিক্ষেত্রে আটক পড়েছ। সারাজীবন এই হাঁড়ুর দৌড় দৌড়াতে হবে, যদি না তুমি উত্তরণের পথ জানো।

"কীভাবে আমি এই চক্র থেকে বের হব"— এমন বোধোদয় যদি তোমার হয়, তাহলে পরের অংশটা তোমার জন্যই।

চলো, একটা এক্সারসাইজ দিয়ে শুরু করি।

এই মুহূর্তে যদি তোমার ইনকাম দিগ্গণ করে দেওয়া হয় তাহলে কী করবে? আপনার কল্পনায় যে জিনিসগুলো আসছে একটি কাগজে লিখে ফেলো।

এবার তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক।

তোমার আকাঙ্ক্ষা কী ছিল?

- কিছু ধার-দেনা আছে, ঐগুলি পরিশোধ করতে হবে।
- আরেকটু ভালো দেশে বাসা ভাড়া নেওয়া দরকার।
- সোফাসেটের কাভারগুলো চেঙ্গ করতে হবে।
- পর্দাগুলোর রং নষ্ট হয়ে গেছে, চেঙ্গ করতে হবে।
- অনেক দিন ধরে ওভেনটা নষ্ট, ঠিক করানো দরকার।

ধরো, তোমার ইনকাম তিনগুণ হয়ে গেছে। এবার কী লাগবে তোমার?

- একটি ওয়াশিং মেশিন খুব দরকার।
- একটি বড় স্ক্রিন এলাইডি টিভি খুব শখ ছিল।
- বিয়ের পর থেকে গিন্নিকে ভালো কিছু

দেওয়া হয় না। একটা গলার হারের খুব শখ ছিল বেচারিব।

- যদি সন্তুষ্ট হয় আগের বাইকটা সেল করে নতুন সিভিজেট্টা নেব।

ধরো, তোমার ইনকাম এখন পাঁচগুণ। এবার কী করবে?

- আববা-আম্মার বহুদিনের স্বপ্ন একটা বাড়ি করার।
- একটা গাড়ি হলে কী যে সুবিধা হতো! পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আর কতদিন?
- ছোটবেলা থেকে দার্জিলিং এ ঘূরতে যাওয়ার ইচ্ছে। সারাজীবন কেবল টিভিতেই দেখলাম, বাস্তবে দেখা হয়নি কখনো।

ওকে, আমাদের এক্সারসাইজ শেষ। তুমি খেয়াল করেছ, তোমার চাহিদাগুলোর একটা প্যাটার্ন আছে। তুমি যে স্তরেই থাকো, সেখান থেকে আরও বেশি খরচের একটা তালিকা আগেই তৈরি হয়ে যায়। এমনকি এই সবগুলোই তোমাকে খাণের দিকে ধাবিত করে। একাউন্টিংয়ের ভাষায় এটিই হচ্ছে লাইয়াবিলিটি।

কেন গরিবরা কেবল গরিব হয়, আর ধনীরা আরও ধনী হয়? কারণ, গরিবদের লাইয়াবিলিটি বেশি, যেখানে ধনীদের এসেট বেশি। এই সিম্পল জিনিসটা বেশিরভাগ মানুষ ধরতে পারে না।

চলো, এসেট এবং লাইয়াবিলিটি আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক।

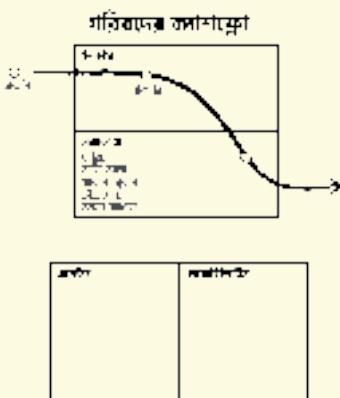
এসেট : খুব সাধারণভাবে বললে, এসেট হচ্ছে যা তোমার পকেটে টাকা এনে দেবে। এমনকি এজন্য তোমাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না।

ধরো, তুমি একটি ছাগলের খামারে বিনিয়োগ করেছ; যেখান থেকে মাসে ১০-১৫ হাজার টাকা ইনকাম হয়। কাজেই এটি একটি এসেট। তোমার কোনো ইন্টিলেকচুয়াল প্রপার্টি থাকতে পারে। যেমন: তোমার লেখা কোনো বই, কোনো সফটওয়্যার, কিংবা এফিলিয়েট ওয়েবসাইট -

এইগুলো সবই তোমার এসেট। এসেটের শর্ত হচ্ছে, এটি তোমার হয়ে কাজ করে ইনকাম জেনারেট করবে।

লাইয়াবিলিটি : যা তোমার পকেট থেকে টাকা বের করে দেবে তাই লাইয়াবিলিটি। খুব সহজ সাদামাটা সংজ্ঞা দিলাম। যেমন : তোমার কার লোন, যেখানে প্রতিমাসে টাকা গুনতে হয়। কাজেই এটি লাইয়াবিলিটি। ফ্ল্যাট বুকিং দেওয়ার সময় তোমার বাবাকে বলা হয়েছে, ফ্ল্যাট একটি মূল্যবান এসেট। কথা সত্যি। তবে এটি তোমার বাবার এসেট না, ডেভেলপার কোম্পানি কিংবা ব্যাংকের এসেট। হাঁ, তোমার বাবার বাড়ি ব্যাংকের এসেট। মাঝে মাঝে অনেক বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড ঝুলে, এই বাড়িটি অনুক ব্যাংকের অনুক শাখার নাম দায়বদ্ধ। বুঝতে পারছ, কেন এই কথা লেখা থাকে?

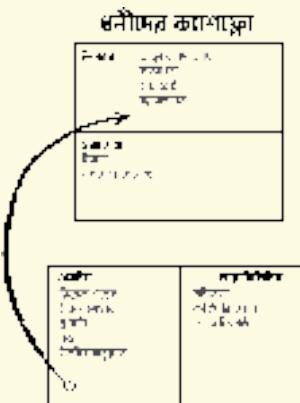
অনেক একাউন্টেন্ট হয়তো আমার এই সংজ্ঞার সাথে একমত হবেন না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষদের বোঝানো। কোনো একাডেমিক সংজ্ঞা না দিয়ে যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বললাম এখানে।



গ্রাফটি লক্ষ্য করো। ওপরের দিকে ইনকাম এবং এক্সপেন্স নিচের দিকে এসেট। এবং লাইয়াবিলিটি। গরিবদের ক্যাশফ্লো সবসময় ইনকাম টু এক্সপেন্স। তারা যা ইনকাম করে পুরোটাই খরচ করে ফেলে। তারা কাজ করলে খায়, না করলে না খেয়ে থাকতে হয়।



মধ্যবিভিন্নদের ক্যাশফ্লো ইনকাম টু লাইয়াবিলিটি টু এক্সপেন্স। মধ্যবিভিন্নদের ইনকাম ভালো থাকা স্বত্ত্বেও তারা সচল হতে পারে না। কারণ, তাদের লাইয়াবিলিটি বেশি। মধ্যবিভিন্নদের সারাজীবন স্ট্রাগল করতে হয় শুধু তাদের কোনো এসেট না থাকার কারণে।



এবার ধনীরাদের ক্যাশফ্লো দেখো। ইনকাম টু এসেট (রিপিট) টু ইনকাম টু লাইয়াবিলিটি টু এক্সপেন্স। ধনীরা ইনকামকে এসেটে কনভার্ট করে যেখান থেকে আবার ইনকাম হয়। এইটাই মূল ম্যাজিক। এবং এই শ্রেণির লোকদের লাইয়াবিলিটি সবসময় কম থাকে।

এবার বুঝতে পারছ, কেন ধনীরা আরও ধনী হয়? কেন গরিবরা আরও গরিব হয়? কেন মধ্যবিভিন্ন সারাজীবন স্ট্রাগল করে?

**আমরা সারাজীবন টাকা-পয়সার
টানাটানি থেকে এই কারণে বের হতে
পারি না যে, আমাদের ইনকাম কম।
না, আমাদের ইনকাম খারাপ না, কিন্তু
আমরা জানি না কীভাবে টাকা-পয়সা
ম্যানেজ করতে হয়।**

আমাদের ফিনান্সিয়াল আইকিউ একেবারেই শূন্য। কারণ, আমাদেরকে ফিনান্সিয়াল ব্যাপারগুলো কোথাও শেখানো হয় না। আমাদের স্কুল-কলেজে এবং পরিবার থেকে শেখানো হয় কীভাবে পড়াশোনা করে ভালো চাকরি অর্জন করতে হবে। কিন্তু কীভাবে টাকা-পয়সা ম্যানেজ করতে হয়, কিভাবে টাকা-পয়সা আমাদের হয়ে কাজ করে আরও টাকা-পয়সা উপার্জন করে দেবে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। ভাসিটি পাশ করা বেশিরভাগ গ্রাজুয়েটদের চেয়ে মুদি দোকানদারদের ফিনান্সিয়াল আইকিউ বেশি থাকে।

বেশিরভাগ মানুষ লসের ভয়ে ইনভেস্ট করতে চায় না। তাদের ধারণা রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তোমার ব্যবহাত স্মার্টফোন, টিভি, ফ্রিজ এগুলোও তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই রিস্ক তো তুমি ঠিকই নিয়েছ। এসেট করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট কোনো রিস্ক নয়। সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক অঙ্গতা। কোনো ব্যবসায় ইনভেস্ট করার জন্য যে পড়াশুনা থাকা দরকার আমাদের তা নেই।

ভাসিটি থাকাকালীন আমার এক বন্ধু আমাকে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করার জন্য উদ্বৃদ্ধ করেছিল।^[১] কিন্তু শেয়ার কেনাবেচে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমার বন্ধুর কাছে আমি এই ব্যাপারে জানতে চাইলাম। সে আগ্রহ সহকারে বুঝাতে শুরু করল, "শেয়ার দুই প্রকার। প্রাইমারি শেয়ার, সেকেন্ডারি শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ারে ইনভেস্ট করলে লস নেই,

তবে লাভ খুব সামান্য। সেকেন্ডারি শেয়ারে লাভ বেশি, বড় বড় লোকজন সেকেন্ডারি শেয়ার কেনাবেচে করে। আমাদের প্রাইমারি শেয়ার দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপর সেকেন্ডারি শেয়ারে যেতে হবে।" ব্যস এতটুকুই।

আমি প্রশ্ন করলাম, "শেয়ারের দাম কখন কমে, কখন বাঢ়ে?" সে উত্তর দিল, "তুমি শুরু করো, আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "কোন ধরনের শেয়ার কিনলে বেশি লাভ হবে?" সে বলল, "আমার এক বড় ভাই আছেন, উনি অনেক দিন ধরে এই লাইনে আছেন। উনিই সবকিছু ঠিক করে দিবেন, আমাদের কিছুই করতে হবে না।"

যে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সেখানে কী করে ইনভেস্ট করব। এটাকে কি আমরা রিস্ক বলব? এটা স্বেচ্ছ লটারি ছাড়া কিছু না। রিস্ক এবং ফিনান্সিয়াল এডুকেশন দুইটা দুই জিনিস।

কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় :

১) অধিক ইনকাম কখনেই টাকা-পয়সার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অর্থনৈতিক বৃদ্ধিমত্তাই কেবল তোমাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি দেবে।

২) ইনকামকে যতটা সন্তু এসেটে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে এসেট তোমাকে প্রতিনিয়ত ইনকাম তৈরি করে দেবে।

৩) গরিবরা টাকার জন্য কাজ করে। পক্ষান্তরে, টাকা বড়লোকদের জন্য কাজ করে।

৪) ইনভেস্টমেন্ট কোনো রিস্ক নয়, যদি তুমি জানো কীভাবে রিস্ক হ্যান্ডেল করতে হবে।

৫) অর্থনৈতিক সম্মতি চাইলে ভয় এবং লোভ - এই দুইটি নেতৃত্বাচক বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে হবে।

৬) টাকা-পয়সার ইমোশনালি সিদ্ধান্ত না নিয়ে ব্রেন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

[১] বর্তমানে শেয়ার মার্কেটে সুদ, হারাম পণ্যের সেনদেনসহ অনেক হারাম অঙ্গসংগীভাবে জড়িত। তাই শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট না করাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

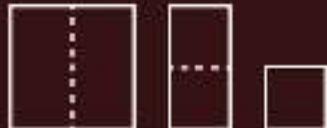
অ বি গ মি

মাওলানা নাহিদ হাসান

কাঞ্জে রঙিন ছাতা

দায়ী লাগাবে : A4 কাগজ, আর্ট কাচ, মেঘিল কল্পাস

- ১) প্রথমে ১২×১২ সে.মি. কাগজের ছাঁচ করে এবং
শৈলশী কাগজ নিউ কাগজগুলোকে যব বরাবর
ভাঁজ করি, প্রয়োগ মন্তব্য বরাবর ভাঁজ করি।



- ২) একটি কাগজের এক পাশে কল্পাস ঢোক করে থোক
পাশে একটি বৃক্ষচার অংকিত কাচ সিঙ্গ করে নিই।



- ৩) এখন কাগজের ভাঁজ খুল দিব্রে ইতো ভাঁজ রাখিয়ে আবার
ভাঁজ দিই। এভাবে সেটি ১৮ টি লাগজই করে নিতে হবে।



- ৪) এখন আবার দায়ায় কাগজগুলো একটির পর একটি জুড়ে
নিতে হবো প্রস্থ নিম্নটি একই রীতে, আরগল নিম্নটি কিন
রাখো। সব খোলা লাগজ হলে কাচ সিঙ্গ এবং পুরুষ
সৌন্দর্য দিতে হবে।



- ৫) এখন A প্রস্থকে ধৰিয়ে এবং B প্রস্থকে সামনে আবাব সাথায়ে
ধৃত দিলে ১০ নং কাগজের কাঁজ ছাতাৰ খুল কাঠামো পেত্তো ধৰে।



- ৬) এখন একটি সুন্দর কাগজ দৃঢ়িয়ে হাতের ডেরি কলে জ্যুতিৰ খুল
কাঠামো ধৰে, ঢেক কলে নিই, হাতগের বাপ একটি পুরুষের
সাহায্যে বৰ্কিহৰ সুন্দৰ করে নিই।



বাস, দেরি হয়ে তেজ কাঞ্জে রঙিন ছাতা।
কেউ আবাব এই ছাতা বৰ্ষায় ব্যবহৰ কেৱে না যেন!



ব্যবসায় নামার আগে..

অবসরপ্রাপ্ত লেখক

নতুন নতুন ইসলামের বুরা পাবার পর
অনেকের মাঝে কিছু বোঁক তৈরি হয়। এর
মধ্যে একটি হলো, হালাল বা সুন্নাহসম্মত ব্যবসা
করার বোঁক। নিঃসন্দেহে এটি অনেক ভালো
চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ
কিশোর-তরঙ্গই মনে করে, সুন্নাহসম্মত ব্যবসা
মানেই আতর-টুপি আর ইসলামি বইয়ের
ব্যবসা। এটা কিন্তু ভুল ধারণা, ভাইয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবি আজমাউন (আল্লাহ
তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) কিন্তু শুধু আতর-টুপি
বা বইয়ের ব্যবসা করেননি। তাই, সুন্নাহসম্মত
ব্যবসাকে আতর-টুপি আর বইয়ের ব্যবসায়
সীমাবদ্ধ ভাবা উচিত নয়। বরং যেকোনো হালাল
ব্যবসাই সুন্নাহসম্মত উপায়ে করা যেতে পারে।

এটা গেল প্রথম ভুল ধারণা। অনেকের মধ্যেই
আরেকটি ভুল প্রবণতা আছে। হট করে মনে
হলো, আর অমনি ফেসবুকে একটা পেইজ খুলে
আতর-টুপি, বই-মধু ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করে
দিল। এটা ঠিক না। ব্যবসা করতে হলে প্রাথমিক
কিছু জ্ঞানার্জন জরুরি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—
উভয় প্রকারই।

তুমি যে জিনিস নিয়ে ব্যবসা করতে চাও বা
উদ্যোক্তা হতে চাও, তা নিয়ে অঞ্চল হলেও কিছু
পড়াশোনা করো। বাজার, চাহিদা, যোগান
ইত্যাদি যাচাই-বাচাই করো। তারপর অভিজ্ঞদের
পরামর্শ নাও। এই উদ্যোগে কী কী অসুবিধা
মোকাবিলা করতে হতে পারে, সম্ভাব্য বুঁকি কী,
সেগুলো সম্পর্কে জানো। তারপর সম্ভাবনাময়
মনে হলে ইসতিখারা করে উদ্যোগ নাও, ব্যবসা
শুরু করো।

কিছুই না জেনে, কিছুই না বুঝে, নিছক বোঁক
আর আবেগ থেকেই কিছু একটা শুরু করে
দেওয়াটা প্রশংসনীয় কিছু নয়। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ
কিংবা সাহাবিদের আদর্শ নয়। বাজার সম্পর্কে,
ব্যবসার পদ্ধতি সম্পর্কে উনাদের অত্যন্ত ভালো
ধারণা ছিল।

**ব্যবসা শুরু করা খুবই সহজ। কিন্তু
আরও বেশি সহজ হলো লস করা।
ব্যবসাতে লাভ-লস থাকবেই। কিন্তু
নিজের ভুলে, তাড়াহড়া, অস্থিরতা বা
নির্মুদ্ধিতায় লস করাটা স্মার্ট মানুষদের
কাজ নয়, ভাইয়া। আমরা মুসলিম।
আমাদের অনেক স্মার্ট হতে হবে।**

সমাপ্ত জীবনের গল্প

তাউসিয়াত জামাত

আহমেদ হোসেন। তার স্তুর কবরের আমনে দাঁড়িয়ে। শিউলিতলার নিচেই কবরের জায়গাটা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার স্তুর যে শিউলি ফুল খুব পছন্দ ছিল!

ঠিক এক বছর আগে এই শিউলিতলা থেকে আমার স্তুর দুটো ফুল এনে চুলে গুজে দিতে বলেছিল! আমি তখন ভুক্ত কুঁচকে জবাব দিয়েছিলাম, ‘তোমার কি আহাদের শেষ নেই? এই রৌদ্রফাটা দুপুরে আমি তোমার জন্য ফুল আনতে যাব!’

‘আমার না খুব ইচ্ছে করছিল! নিচু স্বরে বলেছিল তামা। কমে এক ঢড় মেরে আমি বলেছিলাম, ‘নিজের শখ নিজে গিয়ে পূরণ করো! আমার কাছে বেশি আশা করতে এসো না।’

বউটা সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাকে আমি দিনের পর দিন অবহেলা, অপমান করে গোছি! কিন্তু কখনো তাকে মুখে মুখে তর্ক করতে শুনিনি। আমার বিরক্তে অভিযোগও করেনি কোনো দিন। আসলে তাকে আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। বিয়ের পর সারাক্ষণ মনে হতো,

আমি ওর চেয়ে আরও সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে পারতাম। কী নেই আমার! ধন-সম্পদ, ক্যারিয়ার, স্মার্টনেস, যোগ্যতা! কিন্তু ওর না ছিল বৃপচূটা, না ছিল উচ্চশিক্ষা! ওর বাবাও অত বড়লোক ছিল না। শুধু সালাত, সিয়াম, কুরআন আর পর্দা করেই কি কারও যোগ্য হওয়া যায়! যোগ্যতার মাপকাটি হলো ধৰ্মে সাদা চামড়া, নয়তো বাপের কাড়িকাড়ি টাকা। এর কোনোটাই তামার ছিল না।

কিন্তু আজ আমার তামার জন্য এত খারাপ লাগছে কেন! মেয়েটার সাথে কখনো ভালো ব্যবহার করিনি। বিয়ের পর থেকেই ওর সাথে খারাপ ব্যাবহার করে গেছি সময়ে-অসময়ে। একদিন আমি আমার কলিগ অহনার সাথে কথা বলি। তামা খুব কষ্ট পেয়েছিল। আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডের মতোই কথা হতো। তামা আমায় বলেছিল যাতে বেশি সময় ধরে আলাপ না করি। কারণ ছাড়া কথা না বাড়াই। এতে আমার গুনাহ হবে। তামাকে সেদিন মুখের ওপর বলেছিলাম, ‘তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝতে পেরেছ, তোমাকে আমার মোটেও পছন্দ হয়নি! তুমি আমার কলিগের মতো সুন্দরী হলে, তার সাথে আমি

কথাই বলতাম না!’ তমা একটিবারের জন্যেও বলেনি, ‘বিয়ের আগে আপনি তো আমার সম্পর্কে সবই জানতেন। আমার রূপ, আমার বাবার সম্পত্তি সবই আপনার জানা ছিল। তখন তো বড় গলায় বলেছিলেন—আমার আর কিছুই লাগবে না। তবে এখন কেন এগুলো বলছেন?’

মেয়েটা বড় ধৈর্যশীল ছিল। নিয়তি মনে করে মুখবুজে সয়ে নিয়েছিল সবকিছু। শুধু অহনা নয়, অনেক মেয়ে কলিগের সাথে আমার কথা চলত। আমি ওদের সাথে চ্যাট করতাম, আর তমা আমার পাশেই ঘূরিয়ে পড়ত।

আমার দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে তমা গভীর রাতে উঠে যেত। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করত, সালাত পড়ত চুপিচুপি! একদিন মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে তাহাজুদ শেষ করে গুণগুণ করে কুরআন পড়ছিল তমা। আমার রাগ উঠে গেল। বিছানা থেকে নেমে কয়ে দিলাম এক থাঙ্গড়। বললাম, ‘তুমি জানো না, লাইট জালালে আমার ঘূম আসে না?’

‘আমার ভুল হলে মাফ করে দেন। আমি তো জানতাম না।’ শাস্তি গলায় জবাব দিয়েছিল তমা।

তারপর থেকে সে আর লাইট জ্বালিয়ে তাহাজুদ পড়েনি। আল্লাহর কাছে দুআ করে গেছে আড়ালে আড়ালে। ওর চোখ দিয়ে অঙ্গ ঝরত, কিন্তু মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরোত না। আমি তমাকে মাঝেমধ্যে প্রশ্ন করতাম—‘তুমি কি আল্লাহর কাছে শুধু অভিযোগ করো আমাকে নিয়ে? না কি দুআও করো?’ ও মুচকি হেসে বলত, ‘যামীর নামে কি কেউ অভিযোগ করতে পারে? যারা সবর করবে, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে জামাত দেবেন। সেদিন তো কোনো ইচ্ছাই আর অপূর্ণ থাকবে না। তখন আপনি আমার থেকে চোখটি ফেরাতে পারবেন না। সেদিন আমরা এক দেখায় হাজার বছর পার করে দেব ইনশাআল্লাহ।’

‘তোমার কি লজ্জা বলতে কিছু নেই!
ধরকের সুরে আমি বলতাম তমাকে।
মেয়েটাকে এত অবহেলা করতাম,
তরুণ সে আমার প্রতি ভালোবাসা
দেখাত। কী অদ্ভুত!

আমার এক সন্তান জন্ম দিতে গিয়েই তমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। বেচারী কতই-না ধৈর্যশীল ছিল। তার গায়ের রং কেন ধৰ্বধৰে সাদা নয়, এর জন্যে ওকে কত অপমানই-না করেছি। ওর সামনে ওর বাবা-মা-ভাইকে নিয়ে বাজে কথা বলেছি। কিন্তু ও কিছুই বলেনি। চোখের পানি দিয়ে সব অভিমান ধূয়েমুছে সাফ করে নিত মেয়েটা।

তমার মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। দ্বিতীয় স্ত্রীর চামড়া ধৰ্বধৰে সাদা। বলেতে গেলে আমি নিজেই সাদা চামড়া খুঁজে পাত্রী ঠিক করেছি। কিন্তু বিয়ের রাত থেকেই তার কর্কশ গলা শুনতে শুনতে আমি এখন ক্লাস্টা^[১] ইচ্ছে করেই এখন বাসায় ফিরি দেরি করে। আমি গিয়ে চুপিচুপি ঘূরিয়ে পড়ি। আমি চাই না, এই মহিলার সাথে আমার কোনো কথা হোক। তার কর্কশ আচরণ আমার জীবনটাকে বিষয়ে তুলেছে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, মাটি খুঁড়ে তমাকে বের করে নিয়ে আসি।

আজ এই শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটার কথা মনে পড়ে চোখের জল যেন আর থামছেই না! ওর জন্যে কি আমার হস্তয়ে কোনো জায়গা তৈরি হয়েছিল? আজ খুব বলতে ইচ্ছে করছে, আমি তোমায় মিস করছি, তমা! কিন্তু সে তো আমায় একা করে চলে গেছে আল্লাহর কাছে। বড় অভিমান নিয়ে শুয়ে আছে মাটির বিছানায়।



[১] সাদা চামড়া মানে খারাপ আর কালো চামড়ার মানুষ মানে ভালো—গল্পে এই বার্তা দেওয়া হয়নি। ভুল বুঝো না। গায়ের রং যেমনই হোক, দীনদারিতাই যে প্রধান বিবেচ্য, এই গল্পে সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে।—সম্পাদক





ভালোবাসা বনাম

ভালোবাসা

মাহিন আফরোজ মিস্ট্রি

দৃশ্যপট-১:

সেলিব্রেটি খেলোয়াড় ঘোষণা দিলেন, তার ভক্তদের একজনকে তার একটি জার্সি উপহার দেবেন। তবে সেটার জন্য কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। তরুণ-যুবারা সেই ঘোষণা শুনে হৃদ্দি খেয়ে পড়ল। প্রিয় খেলোয়াড়ের জার্সি বলে কথা! পরম আকাঙ্ক্ষিত পেন্স্ট! যেভাবেই হোক, যেকোনো মূল্যে সেটা পেতেই হবে! স্বপ্নের খেলোয়াড়ের গায়ের স্পর্শ লেগে আছে সেই জার্সিতে। আহ.. ভাবতেই হৃদয় বারবার আন্দোলিত হচ্ছে!

দৃশ্যপট-২:

চাঁদের চেয়েও সুন্দর একজন মানুষ। কিন্তু তাঁর পরনের জামাটি ছেঁড়া। সেটা দেখে আরেকজন মানুষ—যিনি কি না তাঁকে খুব ভালোবাসেন—সেই মানুষটিকে সুন্দর একটি জামা উপহার দিলেন। সুন্দর মানুষটি উপহারের জামাটি বাড়ির ভেতর থেকে পরে আসলেন। জামাটি দেখে আবার আরেক ব্যক্তি আবদার করে বসলেন, ‘আপনি কি আমাকে এই জামাটি উপহার দেবেন?’

মুচকি হেসে তিনি জামাটি খুলে দিলেন; যদিও এটা

ছাড়া তাঁর আর কোনো ভালো জামা ছিল না। তাও তিনি বিনা দ্বিধায় সেটা দিয়ে দিলেন! এটা দেখে আশেপাশের মানুষেরা খানিকটা বিরক্ত হলেন। জামাটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার কী দরকার ছিল! তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কেন এমনটা করলে? তুমি জানো না, তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি কখনো না করেন না?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি তো এটাই চেয়েছি যে, রাস্তাহাতে এর জামা যেন আমার কাফল হয়।’

এই ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসার একটি নমুনা।

দুটি দৃশ্যপটের প্রোক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। দুটোতেই ভালোবাসার গল্প আঁকা হয়েছে। কিন্তু দুটি দৃশ্যপটের ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। একটিতে ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে অস্তঃসারশূন্য; আরেকটিতে ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়ে ধন্য হয়েছে!



আমরা সবাই কাউকে না কাউকে খুব
ভালোবাসি। ভালোবাসা প্রকাশের
ব্যাপারে আমরা বেশ পারদর্শী।
কিন্তু আফসোস, সঠিক জায়গায়
ভালোবাসার প্রয়োগ করতে পারি
না। আমাদের অন্তর আজ বেদখল
হয়ে গেছে! আর তাই, অপাত্তে
অনুভূতি বিলিয়ে দিই আমরা।

যেই ভালোবাসার হক আল্লাহ এবং তাঁর
রাসূলের জন্য বরাদ্দ করার কথা ছিল, সেই
ভালোবাসা আমরা অপচয় করি তথাকথিত
দুনিয়ারি সেলিব্রেটিদের পেছনে। এরাই আমাদের
মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। আমরা ব্যতিব্যস্ত
হয়ে তাদের অনুসরণ করি; তাদের লাইফস্টাইল,
চালচলন আমাদের মুন্দু করে। অথচ না তারা
আমাদের চেনে, না আমরা তাদের চিনি। দিনশেষে
এই ভালোবাসা হয়ে যায় অন্তঃসারশৃঙ্গ।

যেসব ভাইবেরো সেলিব্রেটি-মুক্তায় মন্ত্র,
তাদেরকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে,
'আচ্ছা, কেন আমরা এই ভালোবাসা আল্লাহর
রাসূলের জন্য অনুভব করি না?'

জানো, রাসূল ﷺ একবার বলছিলেন, 'আমার
ভাইদেরকে দেখার জন্য খুব ইচ্ছে করো!'

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল,
আমরা কি আপনার ভাই নই?'
তিনি ﷺ জবাব দিলেন, 'তোমরা তো আমার
সাহাবি। আমার ভাই হলো তারা, যারা আমার
পরে আসবে। আমাকে না দেখেই আমার ওপর
ঈশ্বান আনবে।'^[১]

দেখলে, দেখলে তাঁর উত্তর? আল্লাহর রাসূল ﷺ
আমাদেরকে তাঁর ভাই বলে সম্মোধন করেছেন!
তিনি অনেক কাঁদতেন আমাদের জন্য। এই
ভেবে কাঁদতেন যে, আমাদের কী হবে! হাঁ, এই
আজকের আমাদের কথা ভেবেই তিনি কাঁদতেন।
একদিন দু'দিন না। রাতের পর রাত। আই রিপিট,

রাতের পর রাত! এই ভালোবাসা হল আমলের
বস্তাপঁচা ভালোবাসার মতো ঠুনকো নয়। মিছেও
নয়। এত ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য আমরা নই।
তবুও পেয়েছি। অনেক পেয়েছি। এই ভালোবাসার
হিসেব কি চুকাতে হবে না আমাদের? অবশ্যই
চুকাতে হবে!

যাঁকে ভালোবাসি বলে মুখে দাবি করি, তাঁকে
আরও বেশি করে জানতে ইচ্ছে করে না? আমি
জানি, খুব ইচ্ছে করো। ভালোবাসার মানুষকে তো
জানতে ইচ্ছে করবেই। চলো তাহলে, তাঁকে জানি।
আর অনেক বেশি ভালোবাসি। তাঁকে যত বেশি
জানব, তত বেশি ভালোবাসব। অন্তরে প্রাণহীন
অনুভূতি দ্বারা বেদখল হওয়া জায়গাগুলো কানায়
কানায় পূর্ণ করব রাসূলের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা।
তাঁকে এত ভালোবাসব, যাতে আল্লাহ আমাদের
ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর জানাতে আমাদেরকে
রাসূল ﷺ এর প্রতিবেশি করে দেন!

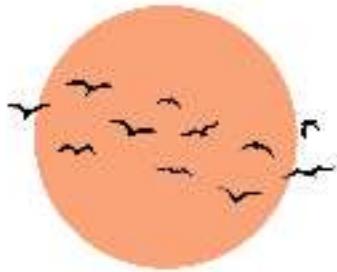
**কল্পনা করো তো, নবিজ্ঞাকে তুমি গ্রেত
বেশি ভালোবেসেছ যে, শেষ বিচারের দিন
তিনি তোমাকে দেখাই উজ্জ্বল একটি
হাসি উপহার দিলেন। তারপর তাঁর পবিত্র
হাত দিয়ে হাউয়ে কাউসার থেকে পানি
পান করতে দিলেন তোমাকে! তুমি তাঁর
সাথে জানাতে প্রবেশ করলে! প্রচন্ড
ফালে গাল দুনিয়ার সকল সেলিব্রেটিকে।
আর সেদিন তুমি বুঝতে পারবে, কে ছিল
আসল সেলিব্রেটি!**

তুমি সেদিন দেখবে, দুনিয়ায় যে যাকে
ভালোবেসেছিল, আজ শেষ বিচারের দিন, তারা
তাদের সাথেই অবস্থান করছে।^[২] ঠিক যেমনভাবে
তুমি অবস্থান করছ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ ﷺ এর সাথে! কারণ,
দুনিয়ায় তুমি তাঁকেই ভালোবেসেছিলে।

পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি!

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং : ১২৫৭৯

[২] মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং : ৬৪৭০



ছেঁড়া খামে চিঠি

ত.সন্দিম জামান, নীলকামারী সরকারি কলেজ

শুকনো পাতাৰ ছ ভৱি ঘোৰা ছেঁড়া কুচকুচৰ
মেথ কুচকুচৰ গুটি অপেই পতিয়ো পথে ধৰ
প্ৰভাৱিস্থ উৰি দিয়ে রথুৱারেৰ ডৰক
ছয়াতলো কৰা পাতা সঞ্জী হয়ে থাক।

বাতাসৰে ছিলো দিয়ে বহুবে শীতল হিম
লটি থাসে ধৰে শিখিৰ, থাসে পড়া বিলা
মিটি রোদে উঠিবে হেসে কলনে বষা ফুল
পৰশ কৰে বসৰ সেধাৰ এগিয়ে দিয়ে চুলা।

চেষ্ট হেলাতো সবুজ ঘাসে নীলক্ষ্য নদীৰ তীৰ
দৃঢ় শীঘ্ৰান্ত হৰ হুনিয়ে গোথালোক ইঁঠিৰ
সেই নদীতে ভিড় কৰেছে খেতপছৰেৰ সন
অজন্তো হাতু ঝুতে পোলেই পালিয়ে যাবৰ ছল।

ৱৎ বলুল লালচে নীড় মিলিয়ে দিবাকৰণ
মিটিপিতি তাৰোৰ আগো সপো নামৰ পৰ।
উল্লানঙ্গুড়ে কোছন মেথে হাবিয়ে যাবাৰ নাম
বলৈ কলৈ বিজায় বাদি সুকিলে দেখে থাক।

ক্ষান্তিৰ অনুথহে দিব্যালোকৰ আশা
অংশি সকল পূৰ্ণ হৰে, নি-তাদিনেৰ বৰঁ।
ছেঁড়া খামে চিঠি জামে, কুকুৰা অভিপ্ৰায়
হয়েৰ কুন্তু যাতেহ উত্তে আৱশ্যে অৱীহ মেথ বা।



গতিময়ভা

সাদগান বিল মাসুদ

সময়েৰ চেয়ে হৃত গুতিৰ,
আজ কি আৰ বিছু?
একলোৰ দে ফুৰিয়ে দেকে,
পাৰে না ধৰলৈ পিছু।

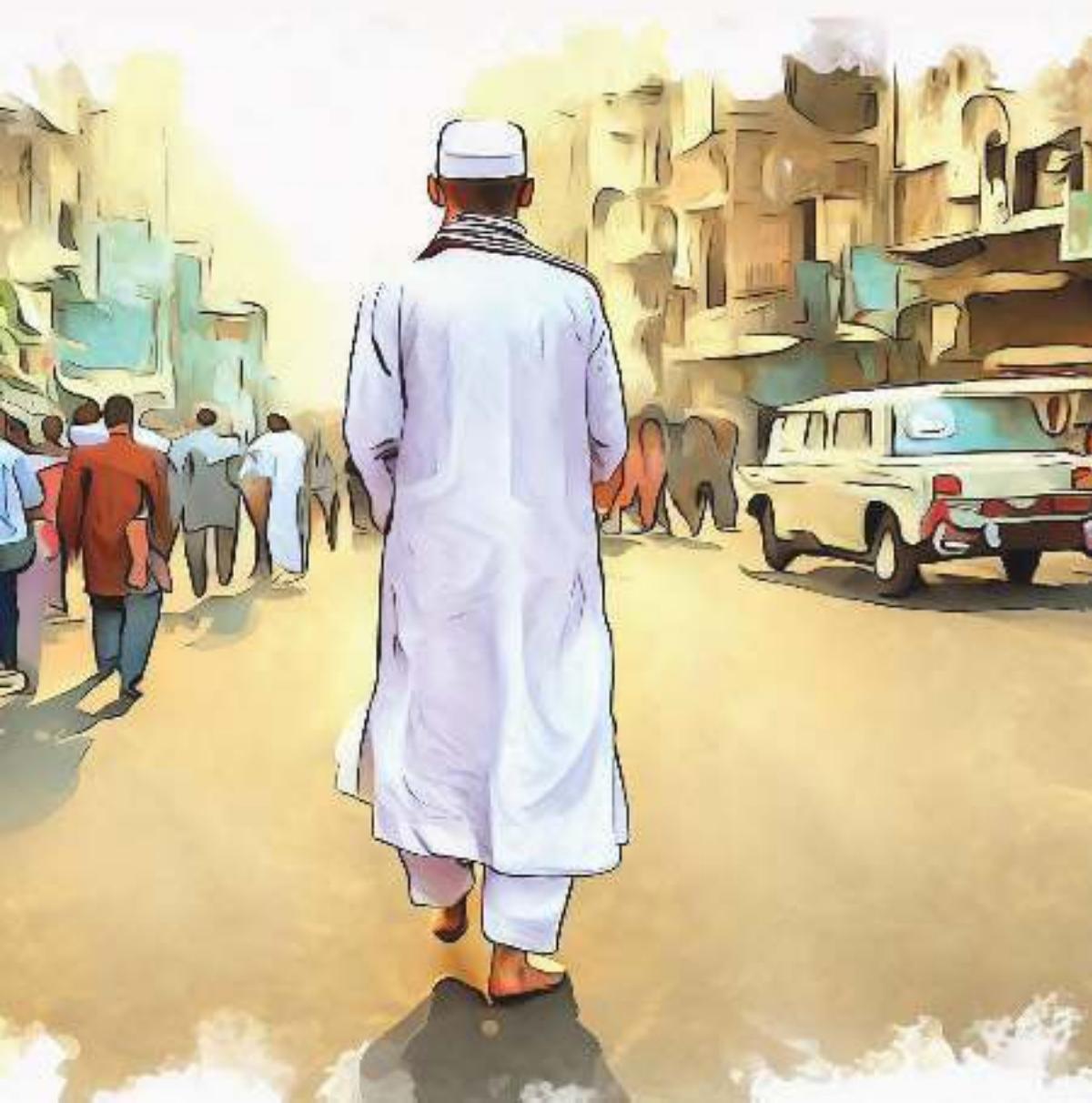
এ সূৰ্য অংগীকে দেৱিৰ
আজ তৰলতাৰ ঘোৱা।
এ সকল সৃষ্টি হৰে দেৱিন
ভয় ভীত-দিশেছাৰা।

জগন্ন এ সুৰক্ষ ফুৰাবীৰ আগে
পৃষ্ঠ কৰে কেৰ যদি কোনো পাপী
শৰণ কৰে আশা কৰতে পাৰে সে,
ৱৰ হে সবাত্তো বেশি কৰাকাৰী।

জগন্ন ত'ৰো কৰে নাশ শকলে
এ বেলা ফুৰোৰাল আগে।
নইলে হথতো যে হাবিয়ে যাবে,
এ মহাকলেৰ অতল গহুৰে।

চোখের সামনে জান্মাত ছবি

এনামুল হোসাইন



চৈত্রের খাঁ খাঁ গরম। দুপুর বেলা। বাস থেকে নামার পর হাঁটতে হলো কিছুটা। ঝান্টি লাগছে। সঙ্গে ত্রঃগতি পেয়েছে। একটা বন্ধ দোকানের শাটারের ছায়ায় একটু জিরানোর জন্য দাঁড়ালাম। সামনে লেবু পানি বিক্রি হচ্ছে। রাস্তার লেবু পানি খাওয়া খুব একটা সুবিধার না। তারপরেও লোভ হচ্ছিল। যাব কি যাব না, মনের সাথে যখন যুদ্ধ করছি তখন চোখের সামনে ঘটে গেল চমৎকার এক ঘটনা।

মধ্যবয়স্ক এক লোক লেবু পানি বিক্রি করছে। মুখে ঘন দাঁড়ি। মোটাটী পড়াশোনা করা লোক মনে হলো। তার পাশের ফুটপাতে বসে লেবু পানি খাচ্ছে এক তরুণ। কাঁধে ব্যাকপ্যাক। ভাসিটিতে যাতায়াত করে বোঝা গেল তা দেখে। এর মুখেও দাঁড়ি। প্যান্ট টাখনুর ওপর গোটানো। এমন সময় সিগন্যাল পড়ল। এক রিকশাওয়ালা যাত্রী বোঝাই রিকশা থামাল। পরিশ্রম আর গরমে দাঁড়ি, টুপিওয়ালা রিকশাওয়ালার মেমে একেবারে গোসল করার মতো অবস্থা। মুখটা একটু পরপর খুলে যাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে।

লেবুওয়ালার কাছে লেবু পানির দাম জিজ্ঞাসা করল। দাম শুনে কিছুটা মলিন মুখে ফিরে গেল রিকশার কাছে। ২০ / ৩০ সেকেন্ড পর কী ভেবে লেবু পানিওয়ালা ডাক দিল উনাকে। বলল— নেন, খান এক প্লাস। দাম দিতে হবে না।

কৃতজ্ঞতার একটা হাসি ঠ্যাটের কোণে উঠেই মিলিয়ে গেল রিকশাওয়ালার। ফুটপাতে বসে লেবু পানি খাওয়া তরুণ উঠে দাঢ়াল। একটা ১০০ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। বলল, বাকি টাকা ফেরত দিতে হবে না মামা। রিকশাওয়ালা মামার বিলটাও রাখেন।

**পেছনে একবারও না ফিরে দ্রুতগতিতে
হাঁটা দিল সে। শাটারের নিচ থেকে
আমিও বের হয়ে পিঙ্গ নিলাম ওর।**

বাসার পথটা ওদিকেই। এই চমৎকার ঘটনায় মুক্ষ। তবে আমার মুঞ্চ হওয়া আরও বাকি

ছিল। একবার পেছনে ফিরলাম। দেখলাম— রিকশাওয়ালাও মাটিতে বসে বসে লেবু পানি খাচ্ছে। চোখের সামনেই জানাতের ব্যবস্থা করে ফেললেন দুইজন। ইনশাআল্লাহ।

নবি কারীম ﷺ বলেন,

‘যে মুসলিম কোনো বন্ধুর কে বন্ধ পথিন
করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জানাতের সবুজ
কাপড় পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কোনো
ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার দেবে, আল্লাহ তাকে
জানাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো
পিপাসার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে, আল্লাহ
তাকে উৎকৃষ্ট জানাতের শরাব পান করাবেন,
যার ওপর সীল লাগানো থাকবে।’^[১]

সহীহ বুখারিতে এসেছে, আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহ
আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত ত্রঃগতি
হলো। তারপর একটি কুপ দেখতে পেয়ে তাতে
সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। ওপরে
উঠে এসে সে দেখতে পেল, একটা কুকুর
হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজা মাটি চেঁটে
খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির
তেমন পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা
পেয়েছিল। তারপর সে কুপের মধ্যে নামল এবং
নিজের মোজা পানিভর্তি করে এনে কুকুরটিকে
পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন
এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।’

সাহাবিগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল!
পশ্চদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব
রয়েছে?’

তিনি বললেন, ‘প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই
সওয়াব রয়েছে।’^[২]



[১] আবু দাউদ, আস-সুনান

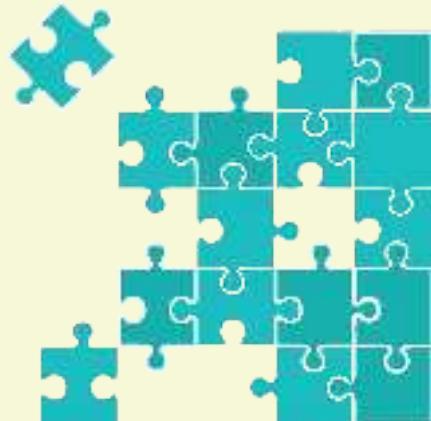
[২] বুখারি, আস-সহীহ, হাদিস নং : ২৪৬৬

গণিত ধাঁধা

- ব্রহ্মীর সংখ্যাগুলো একটি বিশেষ নিয়মে বাঢ়ছে। প্রথমটি সংখ্যাটি কত হবে?



- যদি,
৫ = ৭২
৮ = ৫৬
৭ = ৪২
৬ = ৩০
তাহলে ৩ = ?



বৃক্ষ খাটাও



- বলতে হবে, কিম্চি ছবি যোগ করলে বাইচনেশের কেন জেনার নাম হয়?



- কিম্চি ছবি যোগ করলে একটি সেশের নাম হয়। বলতে হবে কেন সে সেশ?

প্রগল্প

১. A থেকে Z পর্যন্ত ২৫ টি বর্ণ আছে। এখন N ও P, Q আর S এই দিকে বর্ণটি বর্ণ পাব?

২. লজাত, সেন্ট, ইলিশ দিকে লাই পাই হয়।

কতব থেকে কত নিচে বসত পাওয়া যায়?

সমস্যাগুলোর সমাধান করে কলানি পার্টিতে দাও এই লিঙ্গনাম quiz.sholo@gmail.com।

১০ অগ্রন্ত, ২০২ ও এর নিয়ে। মেরিমের সাবক্ষেত্র গোচারে - গুণ্ডি র্ধি। প্রশঞ্চার ইস্মে সুবিধা।
উভয়দার্তাদের র্ধি থেকে লাটারির মধ্যে ৫ জন পারে সালার প্রবর্তী সংখ্যা।

২৫ সহ্যার 'বৃক্ষ খাটি ৬' এর নির্ভূতিগুলোর নাম দাওয়া করে।

মুহাম্মদ ইউসুফ আমিন, হামিদা আকতার সন্তি

Khanik, Nasrafi Jahan Ohi, Iftiakul Hasanai Sohrab

মোলো • ৭৯



আল হিদায়া ইসলামিক লাইব্রেরী

এখানে যোজো ম্যাগাজিন, লস্ট মডেস্টির বইগুলো ও সকল ধরনের ইসলামিক বই পাওয়া যায় এবং সারাদেশে বই ছেম ডেলিভারি করা হচ্ছে।

আল হিদায়া বুক ক্যাফে

আপনি এখানে বসে আপনার পছন্দের বইটি পড়তে পারবেন।

বার্তা : সত্ত্বের সঞ্চালন, উদ্ঘাতন কলাদে

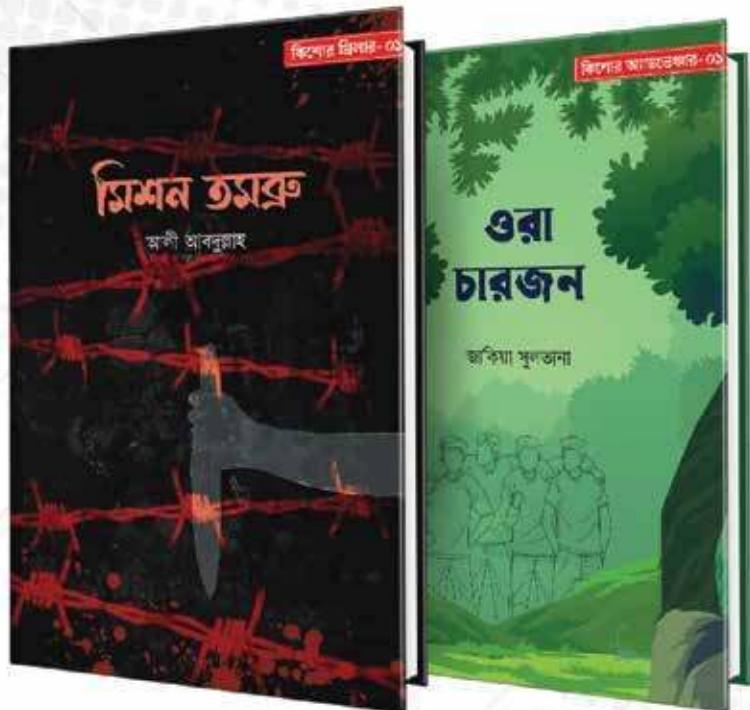
ঠিকানা : তেমুহানী বাজার, পটপাটিয়া, ফেনী।

নংঠার : ০১৮৭১-৪১৬৬৭৬

ফেসবুক পেজ : আল হিদায়া Al Hidaya

ই মেইল : alhidayalibrary66@gmail.com

প্রতিভু
প্রকাশ



কিশোর বয়সে এডভেঞ্চার বা টান টান
উভেজনার রহস্যগল্প পড়তে কেমন লাগে?
যদি খ্রিলারধমী বই পড়তেই তোমার ভালো
লাগে, তাহলে আজই সংগ্রহ করে নাও আমাদের দুটি
কিশোর উপন্যাস ‘ওরা চারজন’ এবং ‘মিশন তমস্ক’।

👤 protivuprokash
✉ protivuprokash@gmail.com
📞 ০১৮০৮ ৯২০ ৭৩৩, ০১৮০৬ ৩০০ ১০০
📍 ৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা



BIBIJAAN

সুখময় অনলাইন জীবনের সম্পাদনা

A collection of 450+ articles,
PDF, audio & video



Download the App



Get it on
Google Play



Download on the
App Store

 www.bibijaan.com